অশোক বসু

স্নেহাস্পদেষু

লেখকের অন্যান্য বই ঃ

কুবেরের বিষয় আশয়

দূরবীনের উল্টোদিকে

ক্ষমতার বারান্দা

যতীন দারোগার বেদান্ত

ভোরের আলো তখনও ভাল করে ফোটেনি। অয়ারলেস মাঠের কোণে রেলিং ঘেঁষে মাদার ডেয়ারির বুথে নানারকমের ক্যান হাতে চণ্ডীঘোষ রোড, বড়ুয়া পাড়া, মুর অ্যাভিনিউয়ের বাসাবাড়িগুলোর কাজের লোক, কর্তা-গিন্নি, ছেলে-ছোকরা দুধ নেবে বলে লাইনে দাঁড়িয়ে। মাঠের মাঝখানটায় দু-তিনটে ফুটবল টিম—কিশোর থেকে যুবক সব বয়সের প্লেয়ার—খালি পা—পায়ে বুট—বলে কিক্ দিচ্ছে, হেড করে সেই কিক্ কেউ বা ফিরিয়ে দিল। মাঠের সীমানা ধরে মর্নিং ওয়াকারদের নানা রকমের হাঁটা। তাদের দেখতে দেখতে একটি কানঝোলা গোল্ডেন রিট্রিভ কোনদিকে দৌড়ে শরীরটা ঠিক রাখবে বুঝে উঠতে পারছে না। একবার মাদার ডেয়ারির ডিপোর দিকে দৌড়য়—খানিকটা ছুটে ফিরে আসে—আবার গোলপোস্টের দিকে দৌড়য়।

রোদ উঠতে এখনও বেশ দেরি। এই সময়টাই কলকাতা খুব আরামের। ভোররাতের ফিকে আলো। ফিনফিনে বাতাসটা হিমহিম। মে মাসের মাঝামাঝি। ঘণ্টা দেড়েকের ভেতর ঝা-ঝা রোদ বেরিয়ে পড়বে।

দুটো লম্বা কান ঝুলিয়ে লালচে বাদামি লোমে ঢাকা শরীরটা কোমরের কাছে সরু। মাথার দিকে—গলায় মেদ নেই। পা চারখানি পিস্টনের মত। শরীর যে এগোয়—ঝোঁক নিয়ে ফিরে আসে, তা সবই ওই পিস্টনের কারিকুরি।

মাঠের আরেকদিকের গোলপোস্টের কাছে একজন লোককে ফিকে অন্ধকারের ভেতর একটু একটু করে ফুটে উঠতে দেখা যাচ্ছে। এখন তাকালে বোঝা যায়— তার হাতে চামড়ার একটি চাবুক। শ্লেট রঙ

শর্টসের ওপর হাফহাতা গেঞ্জি। নীল রঙের। পায়ে কেডস্। সাদা। তার বাইরে মোজাও সাদা।

আরেকটু আলো ফুটতে দেখা গেল—ক্রু কাট চুল মাথায়। খাড়াই নাক। সে এক জায়গায় জগিং করতে করতে চেঁচিয়ে উঠল, সোনালি—সোনা-আ-লি—

চড়া, ভাঙা ভাঙা গলা। তাই দু'কানে ভরে নিয়ে মাথাটা সামনের দুই পায়ের ভেতর খানিকটা নামিয়েই তুলে নিল। তারপর গোল্ডেন রিট্রিভ বড় বড় গ্যালপে মাঠ ফুরিয়ে দিয়ে তার কাছে ছুটে গেল। বাতাস কেটে। কেশর বাগিয়ে। তারপরেই হাড় গুঁড়োনো গাঢ় গলায় বিরাট এক—ঘেউ-উ—

এবার দেখা গেল—শ্যামলা রঙের লোকটি স্পট জগিং করেই চলেছে। সরু কোমর। চ্যাটালো বুক। লোকটার পা দু'খানি যেন তার গোল্ডেন রিট্রিভের পায়ের মতই একেবারে পিস্টন। সারা শরীরটা পায়রার পালক। হাল্কা সোলার মতই সে শূন্যে উঠছে। পড়ছে। পাশে দাঁড়িয়ে সোনালি পরম ভক্তিভরে লোকটির শূন্যে লাফিয়ে ওঠা আর শূন্য থেকে মাটিতে নেমে আসা দু'চোখ ভরে দেখে চলেছে। জিভ বের করে। আহ্লাদে, আনন্দে লালা বেরিয়ে এসে তার নাকের ডগা ভিজিয়ে দিল।

এভাবে কিছুক্ষণ চলার পর লোকটি দৌড়তে শুরু করল। দৌড় দেখে বোঝাই যায়—সে অন্তত তিরিশ বছর এমন দৌড়ে আসছে। কোন চেষ্টা নেই। কষ্ট নেই। অথচ শুধুই সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পিছনে ছুটে আসা সোনালি তো মুগ্ধ। সে মনে মনে বলল, বাবা। তুমি কী সুন্দর দৌড়োও। অথচ তোমার মুখ দিয়ে আমার মত কোন লালা বেরোয় না। আমি যতদিন বাঁচব—ততদিন তোমার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ব—শুধুই দৌড়ব সোনালি শব্দ না করে—আওয়াজ না দিয়ে কিছু ভাবতে পারে না। তাই আবারও সেই হাড় গুঁড়োনো গাঢ় গলায়—ঘেউ বেরিয়ে এল তার মুখ দিয়ে।

এবার সারা মাঠ দৌড়ন্ত লোকজন সমেত আরও স্পষ্ট হয়ে

উঠল। এগার বারো ক্লাসের কয়েকটি মেয়ে যত না হাঁটছে—হাঁটতে হাঁটতে তার চেয়ে বেশি হাসছে—কী এক হাসির কথায়।

এমন সময় মাঠের লোহার গেট সরিয়ে একটি মেয়ে ঢুকল। সে মর্নিং ওয়াকারদের স্রোতটা পার হয়ে মাঠের ভেতর দিয়ে সিধে ওই লোকটির কাছে এসে দাঁড়াল। পরনে সালোয়ার কামিজ। বাসন্তী রঙের ওপর কালো ফুল ফুল ছোপ।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটির জগিং বন্ধ হয়ে গেল। সোনালি আদরের ভঙ্গিতে মেয়েটির ডান হাতের আঙুলগুলো টুক করে একবার চেটে দিল।

তুমি আর আসবে না বলে দিচ্ছি।

কেন ?

না। কেন তুমি আস ?

তোমরা কেমন আছ তাই দেখতে যাই।

আর যাবে না। কী দরকার তোমার ?

তুমি পড়ছ কেমন জানব না ? সামনের বছর এইচ এস দিচ্ছ। মহুয়ার ডান পায়ের গোড়ালির নিচে ব্যথাটা গেল ? জুতোর ডিফেক্টেই এসব হচ্ছে। জুতো বদলাতে বলেছি—তা কি শুনবে ! সঞ্জয়ই বা কেমন ছেলে ? এসব দেখে না ?

সঞ্জয়কাকু যা আলসে। ঘুম থেকে উঠবে আটটায়।

উঠেই চো চা দৌড়। চা খেয়ে বাথরুমে। চান করে বেরিয়ে এসেই খেতে চাইবে।

ছিঃ ! শিখা। সঞ্জয়কাকু তোমার বাবা। তোমার মা তাকে বিয়ে করেছে। বাবার নাম ধরতে নেই—

না। বাবা তুমি। তুমি তুষার সরকার আমার বাবা।

একসময় আমি তোমার বাবা ছিলাম। যখন আমি তোমার মায়ের স্বামী ছিলাম। এখন সঞ্জয়ই তোমার বাবা। তুমি আর শিখা সরকার নও। শিখা ঘোষাল। সঞ্জয় ঘোষাল বড় ভাল ছেলে। মনটা বড় উদার। আমি গেলে কত খাতির করে বসায়। তুমি

এখন বড় হচ্ছ। সবই তোমায় বলতে পারি। আমি গেলে যদি বা মহুয়া কিছুটা আড়ষ্ট হয়ে পড়ে—সঞ্জয় কিন্তু সবই সহজ করে নেয়। এত সকালে কোথায় যাচ্ছিলে ?

সমর স্যারের টিউটোরিয়ালে। তোমায় দেখতে পেয়ে এলাম।

ভাল কথা। সমরকে বোলো তো তার এপ্রিল মাসের টাকাটা দিয়েছি কিনা ?

দিয়েছ। আর দেবে না। সঞ্জয় ঘোষালই যদি আমার বাবা তো সে কেন সমর-স্যারের টাকাটা দেয় না ?

দেবে। দেবে। একদিন দেবে। অফিসে উন্নতি করুক—মাইনে বাড়ুক। তখন সে একাই সব পারবে। মাত্র তিন বছর তো বিয়ে করেছে তোমার মা মহুয়াকে। অল্প বয়স। সবদিক সামলে উঠুক —তখন সব করবে। খুব ভাল ছেলে। অফিসে একটা প্রমোশন পেলেই—

শিখা বড় বড় চোখে ফের স্পট জগিং শুরু করা তুষার সরকারকে দেখল। তুষারের হ্যাবিট সে জানে। রাত থাকতে উঠে শর্টস পরে মাঠে চলে আসা চাই। দৌড়ঝাঁপে ঘেমে উঠে মাঠ থেকে ফিরে যাবে ছ'টা স'ছটায়। হাফ পাঁইট মোষের দুধের সঙ্গে এক কোয়ার্টার মিল্ক ব্রেড, দুটো কলা আর একটা ডিমসেদ্ধ। ব্যস। ব্রেকফাস্ট শেষ।

যাই, বলে মাঠের গেটের দিকে শিখা ফিরে গেল। সোনালি তাকে খানিকটা এগিয়ে দিতে গম্ভীর মুখে গেট অব্দি গেল। অয়ারলেস মাঠ বা পার্ক ঘিরে এত বাড়ি—বাড়িগুলোর পেছনে এতরকমের রোড, স্ট্রিট, লেন—সেসব জায়গায় এত লোক—যাদের অনেকে এখানে হাঁটতে, ছুটতে, চুপ করে বসে থাকতে আসে। কে কার সঙ্গে দেখা করল—দেখা করে কী বলল—এসব নিয়ে কেউ মাথাই ঘামায় না। পার্ক থেকে বেরিয়ে খানিক এগোতেই বাস রাস্তা। সেটা পেরিয়ে আদিগঙ্গার ধারাধারি সমর স্যারের বাড়ি। এক থাক বাড়ির পেছনে। আগে যখন বড় গঙ্গা থেকে জোয়ারের জল ঢুকত—শিখাও দেখেছে—এখনও বছরে চার-পাঁচদিন ঢোকে—তখন এই ময়লা, নোংরা, দুর্গন্ধ,

চওড়া ড্রেনটাকে কিছুক্ষণের জন্যে নদী বলে ভুল হয়। তবু সমর স্যারের বাড়ি যাবার সরু চিলতে রাস্তাটা শিখাকে কেমন যেন গাঁয়ের চেহারা মনে করিয়ে দেয়। যদিও সে গ্রাম দেখেছে পড়ার বইয়ের আঁকা ছবিতে। নিমগাছ, বকুলগাছ এখানে ছায়া দেয়। পাখির ডাক। মনে হয়—কলকাতা নেই এখানে।

টুক করে কী একটা গায়ে এসে লাগল। শিখা দেখল, ঘাসের ওপর দলাপাকানো একটা কাগজ। কুড়িয়ে নিয়ে দেখল। তারপর পেছনে ফিরে বুকের ওপর থেকে মোটা বিনুনিটা পিঠে মেলে বলল, এই শোন্। আয়। কাছে আয়। আমি চেঁচাব না। ভয় নেই—

শিখার পেছনে হাত দশেক দূরে সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে হাত দিয়ে একটি ছেলে দাঁড়িয়ে। মুখে চোখে ভয়। শিখা দেখল—ছাই রঙ ট্রাউজারের ওপর বাসন্তী রঙের কলার তোলা গেঞ্জি। বুক খোলা। পায়ে হাওয়াই। ডান হাতে কালো প্লাস্টিকের ব্যাটারি ঘড়ি।

আয় না। কিছু বলব না।

তবুও ছেলেটি এগোল না। শিখার মনে হল—ছেলেটার ঠোঁট কাঁপছে।

তুই তো পল্টু ?

আমার ভাল নাম অশোক।

এবারও এইচ এসে গাড্ডা খেয়েছিস। তা প্রায়ই আমায় ফলো করিস—গোল্লা পাকিয়ে আমাকে কাগজ ছুঁড়ে মারিস।

আমি তোমাকে ভালবাসি।

সেই কথাই তো কাগজে লিখে ছুঁড়ে মারিস। আই লাভ ইউ। জানি।

অশোক ডান হাতের ভেতর ধরা সাইকেলের ব্রেকটা চেপে ধরল অজান্তে।

ভালবাসার তুই কিছুই জানিস না অশোক। বাড়ি যা। বাড়ি গিয়ে ভাল করে পড় যাতে এবার পাস করতে পারিস।—বলেই শিখা

সমর স্যারের বাড়ির দিকে এগোল। বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। চ্যাটাই বেড়ার দেওয়াল। ওপরে অনেক উঁচুতে ঢেউ টিন। যাতে গরম না হয়। সমর স্যার বারান্দায় শতরঞ্চি পেতে বসে পড়েছেন। আদি গঙ্গার ওপর দিয়ে মিনিবাস যাচ্ছে করুণাময়ী বাজারের দিকে। রোজ সকালে যায়। ধোলাই হতে। সমর স্যার গ্রুপ টিউশনি করেন বাড়ি বসে। পয়লা ব্যাচের ছ'সাতজন বসে। শিখা সেকেণ্ড ব্যাচের।

পেছন থেকে অশোক গলা তুলে বলল, শোনো।

কিছু অবাক হল শিখা। তাকে ফলো করে করে এতটা এসে পড়েছে।

অশোক গম্ভীর গলায় বলল, আমি তোমাকে ভালবাসি।

শিখা কিছু না বলে ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল, তাই!

হ্যাঁ। ভালবাসা আমিও জানি। শুধু তুমি, তোমার বাবা আর মা জানে তা ভেব না।

রাগে শিখা বলে উঠল, কী? কী বললি?

যা বলেছি—ঠিকই বলেছি, আর তুমি তা ঠিকই শুনেছ।—বলেই সাইকেল ঘুরিয়ে সিটে লাফিয়ে উঠে বসেই অশোক বাস রাস্তার দিকে প্যাডেল করল।

শিখা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল—সেখানেই রইল। তার পা উঠছে না। অশোককে আর দেখা যাচ্ছে না। কার কথা বলল ও? বাবার কথা? আমার বাবার কথা? কোন্ বাবার কথা? তুষার সরকার? না, সঞ্জয় ঘোষাল?

দুই

রাসবিহারির ওপর 'নোটেশন' নামে দোকানে খদ্দেরদের জন্যে নানান ক্যাসেট বাজে। কখন কালোয়াতি। কখনও হেমন্ত। কখন সরোদ, সেতার বা পিয়ানো। আবার কণিকা-সুচিত্রাও।

তুষার সরকার হাঁটতে হাঁটতে দাঁড়িয়ে পড়ল। কালচে লাইনটানা হাফ-হাতা গেঞ্জি শ্লেট রঙ ট্রাউজারের ভেতর গুঁজে পরেছে সে। তার ওপর মোটা বেল্ট। পায়ে খেলোয়াড়ি ছাই ছাই সু। খাড়াই নাকের নিচে মোটা গোঁফ। বাঁ হাতের কব্জিতে কালো ডায়ালের ঘড়ি। রাস্তা থেকেই সে হাসি হাসি মুখে কাউণ্টারে বসা চোখে-চশমা মানুষটির মুখে তাকাল। এসেছে ?

রাস্তায় ফুটপাথ জুড়ে হাজারো জিনিসের পসরা। চলতি মানুষের নানান কথা। খদ্দেরের পছন্দসই ক্যাসেট বের করতে করতেই মাথা তুলতে পারছে না মানুষটি। দোকানের ভেতরের আলোয় ক্যাসেটের নানান ছবি ঝকঝক করছে।

তুষার ফুটপাথ থেকেই গলা তুলল, বিশুবাবু—ও বিশুবাবু—

চোখে-চশমা মুখখানা কাউণ্টার থেকে রাস্তার দিকে তাকাল। ক্যাসেট বেছে খদ্দেরদের দিতে দিতে যেন সেই সব ক্যাসেটের গানে চশমার পেছনের চোখ জোড়া আচ্ছন্ন। আসুন—ভেতরে আসুন।

আমারটা এসেছে ?

কোন্‌টা বলুন তো ?

এবার তুষারকে দোকানের ভেতরে যেতেই হল। খুব চাপা গলায় বলল—সেই যে—

কোন্ গানটা বলবেন তো। আপনার তো আবার পল্লীগীতি—ফোকসঙ পছন্দ। কোন্ গানটা বলবেন তো। এত গানের ভেতর কোন্‌টা মনে রাখি বলুন—

'যদি সুন্দর একখান মুখ পাইতাম—'

বিশুর বয়স এই পঞ্চাশের নিচেই। তুষারের চেয়ে ছ-সাত বছরের বড় হবে। মাথার সামনের চুল পিছিয়ে গেছে। দোকানের কাউণ্টারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে থাকতে শরীরটা খুব ভারি হয়ে গেছে।

তুষারের অ্যাডভাইসে এখন বিশু রোজ সকালে পার্কে হাঁটে ঘড়ি ধরে। তুষার বিশুকে একটা ডায়েট চার্টও করে দিয়েছে। ভাত-

রুটি একদম নয়। আলু, চিনি, রেডমিট বারণ। সকালে বিকেলে—পেয়ারা একটা করে। ফ্যাট-ফ্রি দুধ, সেই দুধের দই, ছোট মাছ। আর প্রচুর সব্জি। এসব নিয়ে তুষারের সঙ্গে তার প্রায়ই কথা হয়—যখন দুপুরের দিকে খদ্দের কম থাকে।

আর মনে আছে?

মনে তো আছে তুষারের। কিন্তু এত লোক। চোখে চশমা দুটি মেয়ে—হয়ত চাকরি করে ভাল—ঢেলে ক্যাসেট কিনছে—একজন গম্ভীর মুখের লম্বা ভদ্রলোক—বারবার ফৈয়াজ খাঁর ক্যাসেটটা নাড়ছেন। এর ভেতর গানের পরের কলিটি বলতে কেমন বাধবাধ লাগল তুষারের। সে এবার আরও চাপা গলায় বলল—

যদি সুন্দর একখান মুখ পাইতাম—

এক খিলি পানো বনাইয়া খাওয়াইতাম—

খদ্দেররা কেউ কেউ তুষারের মুখে ফিরে তাকাল।

বিশু বলল, ফোক? কে গেয়েছে?

শেফালি ঘোষ—

ওঃ! এ ক্যাসেট পাবেন না এখানে। চট্টগ্রামের গাইয়ে। লোকাল ভাষায় লেখা গান। নামটা শোনা আমার। নিশ্চয় রেডিও বাংলাদেশে শুনেছেন।

হ্যাঁ। বুঝলেন কী করে?

ফোকসঙে ওপারে ভাল ভাল ভয়েস আছে। ওদিকে কেউ গেলে তাকে এনে দিতে বলতে পারেন।

গলাটা এত ভাল লেগেছে তুষারের—গানটা সে ভুলতেই পারছে না। ভরাট। কী একটা পার্সোনাল টাচ আছে। যেন শেফালি ঘোষ নিজেই পানের বাটা নিয়ে তার সামনে পান সাজতে বসেছে।

আরও কিছু কথা ছিল তুষারের। এখন তা বিশুকে বলা যাবে না। লোকে থই থই করছে দোকান।

নোটেশন থেকে বেরিয়ে তুষার খানিক এগিয়ে একটা রোল কর্নারের সামনে দাঁড়াল। সন্ধের মুখে পথচলতি মানুষ সারাদিন

গরমের পর হাওয়ার লোভে যে যেদিকে পারছে ছড়িয়ে পড়ছে। আজ আমি যে করেই হোক শেফালি ঘোষকে খুঁজে বের করব। এরকম একটা জেদ নিয়ে সে ভাবল, নোটেশনে না পাই অন্য দোকানে তো পাব। এত ক্যাসেটের দোকান—কেউ কি ওপার থেকে শেফালি ঘোষের ক্যাসেট আনেনি? হতেই পারে না। নিশ্চয় কেউ এনে থাকবে। যদি সুন্দর একখান মুখ পাইতাম—

আর এগনো হল না তুষারের। বেশ সুন্দরী একটি মেয়ে। তুষারের মুখের দিকে তাকিয়ে এগিয়ে আসছে। মাথাভর্তি চুল। চোখ দুটি বেশ বড়। তুষার বুঝল, তাকে দেখতে ভাল লাগছে মেয়েটির। এই সাতাশ আঠাশ কি তিরিশ হবে। নিশ্চয় শেফালি ঘোষ। শেফালির তাকানোতে কোন রাখঢাক নেই। ত ষার সরকার রেগুলার এক্সসারসাইজ করে। তার শরীরের ভেতর একই সঙ্গে আনন্দ আর একটা বিশ্বাস ফিরে আসছে। সে কোমরে হাত দিয়ে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে রাস্তার উলটোদিকের ছাদে লাগানো হোর্ডিং পড়তে লাগল। যাক্! আমার জগিং তাহলে সার্থক।

শেফালি ঘোষ তাকে পাস করে চলে গেল।

তুষার মনে মনে বলল, ধুস! শেফালি ঘোষ কেন হবে? তিনি তো থাকেন চট্টগ্রামে। নিশ্চয় চট্টগ্রামে। যদিও আমি জানি না তিনি সত্যিই চট্টগ্রামে থাকেন কিনা। হয়ত ঢাকাতেও থাকতে পারেন। অবিশ্যি ওই গানটা তিনি কোথায় পেলেন? কএদম চট্টগ্রামের ডায়ালেক্টে লেখা। এক খিলি পানো বনাইয়া খাওয়াইতাম। পানকে—পানো। বানাইয়ার জায়গায় বনাইয়া। এ-গান পেতে হলে তো চট্টগ্রামের ভেতরে ঢুকে যেতে হয়। চট্টগ্রামে না থাকলে তো এ-গান পাওয়া যায় না।

ভিড়ের ভেতর মিশে আবারও একটি মেয়ে উলটোদিক থেকে এগিয়ে আসতে আসতে তুষারের মুখে চোখ পড়তেই সে ফিরে ফিরে তুষারকে দেখতে দেখতে পা ফেলতে লাগল। তুষার বুঝল, তাকে দেখেই মেয়েটি আর চোখ ফেরাতে পারছে না। সে তার চ্যাটালো

বুকের নিচে কোমরে হাত রাখল। ঘাড় ঘুরিয়ে একটা তেরছা ভঙ্গিতে দাঁড়ানোর জন্যে তার শরীরটা যে কত ছিপছিপে—ছিমছাম—তা যেন তুষার নিজেই দেখতে পেল। ফের একই সঙ্গে একটা আনন্দ আর বিশ্বাস—হ্যাঁ আমি এখনও আগের মতই আছি—তেমনি জগার—চিতা চিতা ভাব—তার মনে ছড়িয়ে পড়ল।

শেফালি ঘোষ তাকে পাস করে উলটোদিকে চলে গেল। যদি সুন্দর একখান মুখ পাইতাম—

ধ্যুস! শেফালি ঘোষ এখানে কোত্থেকে আসবেন? কেনই বা আসতে যাবেন? তাঁর কত নাম। ঢাকায় হয়ত এখন তিনি কানে হেডফোন লাগিয়ে স্টুডিওতে বসে রেকর্ডিং করছেন।

আমার কেন এমন হয়? একটু ভাল দেখতে একজন মহিলা যদি আমার পাশ দিয়ে গেল তো অমনি আমার ইচ্ছে হল—আহা! যদি আমারই জন্যে পান সাজতে বসে তিনি গাইতেন—যদি সুন্দর একখান মুখ পাইতাম—

একথা ভাবতেই আমার ভেতরে আনন্দ আর কনফিডেন্স একই সঙ্গে সারা শরীরে ঢেউ হয়ে বয়ে যায়। এটা কি আমার কোন রোগ? বাইশ-তেইশ বছরের যুবক হয়ে উঠতে থাকা থেকে এই তেতাল্লিশ অবধি আমি এই রোগ কিংবা আহ্লাদ শরীরে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি?

ত্রিকোণ পার্ক ছাড়িয়ে 'ক্যাসেট কর্নারে' এসে তুষার সরকার ফের জানতে চাইল, শেফালি ঘোষের কোন ক্যাসেট আছে?

শেফালি ঘোষ?

চেনেন না। সেই যে ওই গানটা—যদি সুন্দর একখান মুখ পাইতাম—

ছোকরা মত দোকানি যেন গাছ থেকে পড়ল। ওরকম কোন গান তো শুনিনি। কী গানটা আবার বলুন তো—

শোনেননি? আশ্চর্য! যদি সুন্দর একখান মুখ পাইতাম—

ক্যাসেট কর্নারের দোকানি তুষার সরকারের চেয়েও বেশি আশ্চর্য হল। এরকম খদ্দের সে কখনও দেখেনি। চেহারায় ফিটফাট—

ছিমছাম—রীতিমত লম্বা। পোশাক-টোশাকে বেশ মডার্ন। অথচ গান খুঁজছেন—যদি সুন্দর একখান—

দোকানি ছোকরা ফের বলল, আরেকটু বলবেন দয়া করে—

ক্যাসেট কর্নার প্রায় ফাঁকা। মোটে একজন খদ্দের ক্যাসেট বাছছে। তুষার সরকার প্রায় গানের মত করেই গেয়ে উঠল—

যদি সুন্দর-র-র
যদি সুন্দর-র-র
একখান মুখ পাইতাম—
এক খিলি পানো-ও
বনাইয়া খাওয়াইতাম—

তিন

সাদা মারুতি এসে থামতেই পেছনের দরজা খুলে যিনি নামলেন—তাঁকে দেখে একজন বেশ সুবেশ, হাসিমুখ—রীতিমত তাজা যুবকই বলা যায় ঝকঝকে দাঁত বের করে—তার চেয়েও ঝকঝকে গলায় বলল, গুড মর্নিং মিসেস সরকার—

মিসেস সরকার রাস্তা থেকে ঢাকা পোর্টিকোয় উঠতে উঠতে বলল, নাউ আই অ্যাম নোবডিজ মিসেস। থ্যাঙ্ক ইউ মিস্টার কিচেন একজিকিউটিভ!

হোটেল ম্যানেজমেণ্ট পাস করা হলিডে ইনের কিচেন একজিকিউটিভ কিছুটা মিইয়ে গিয়ে বলল, সরি! আই অ্যাম নট আপডেটেড তপতী।

হলিডে ইনের রিসেপশন কাউণ্টার দেখার মত। রুম সার্ভিস ডেকের পাশ দিয়ে চেনা এলাকার ওপর জুতোর সামান্য আওয়াজ তুলে তপতী একবার চাবির খোপগুলোয় চোখ বুলিয়ে নিল। প্রায় তেতলা সমান উঁচু ডোমসিলিং থেকে কনসিলড ল্যাম্পগুলো চাপা আলো ছড়াচ্ছে। আগাগোড়া এয়ারকণ্ডিশনড। এখানে বাইরের

গরম, ধুলো, ঘাম—কোন কিছুই নেই। তপতী বলল, শোন পুলক—

কিচেন এক্‌জিকিউটিভ পুলক বোস শুধু শুনছিল না। চোখ ভরে দেখছিলও তপতীকে।

আমি আবার সেই তপতী দত্ত। সোমার মা তপতী।

পুলক সকালবেলার এই আটটা সওয়া আটটায় কিছু ফ্রি থাকে। এই সময়টায় সে হলিডে ইনের জেনারেল ম্যানেজার মিসেস বাটিওয়ালাকে উইশ করতে যায়। আর উইশ করে ফুড অ্যাণ্ড বিভারেজ ম্যানেজার মিস্টার তারপোরভালাকে। সারা এশিয়া জুড়ে পারসিদের হোটেল চেইনে কলকাতায় এই হলিডে ইন আগাগোড়া পারসি ম্যানেজমেণ্টে চলে। মিসেস বাটিওয়ালার অফিসঘর থেকে বেরিয়ে সামনেই ব্যাংকোয়েট হল। তার পাশ দিয়ে এক প্যাচের সিঁড়ি নেমে গেছে বিশাল রিসেপশন হলে। সেখান থেকে বেরিয়েই পোর্টিকো। তপতীকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে পুলক এগিয়ে গিয়েছিল। হোটেলের কাজে এক নম্বর দরকারি জিনিস—এক মুখ হাসি। সেই হাসি দিয়েই কথা শুরু করেছিল পুলক। সে আর তপতী প্রায় একই সময়ে হলিডে ইন-এ ট্রেনি হয়ে ঢোকে। তাই পুলকের হ্যালো বলতে যাওয়া। গুড মর্নিং বলা। সে এখন আর হাসতে পারল না।

চৌরঙ্গির রাস্তা থেকে হোটেল হলিডে-র যেটুকু দেখা যায়—তা হচ্ছে ঝলমলে—তকতকে।

যেদিকটা দেখা যায় না—সেদিকটা বেসমেণ্টে। রাস্তার সমান সমান ফ্লোর থেকে নিচে নেমে গিয়ে সে আরেক জগৎ। পুলক সেই জগতের বাসিন্দা। সেই জগতে ঢুকতে ঢুকতে তপতীর কথায় পুলকের মনটা খচখচ করে উঠল। এ হোটেল আগের সেঞ্চুরির। তাই আগাগোড়া মেহগিনির প্যালেস। ভারি কার্পেট। ঝাড়গুলো আজকের নয়। ড্রেসডেন থেকে আনানো। যিনি এই হোটেল শুরু করেছিলেন—সেই বিখ্যাত ওবেরয় বংশের শেষ সলতে তিরিশ বছর

আগেও রবিবার সকালে নিজে বসে বসে বিয়ারের খালি বোতল পুরনো খবরের কাগজ ওজনে বিক্রি করতেন। তারপর হাতবদল হয়ে পারসিদের হাতে পড়ে নাম পালটে হলিডে-ইন। ভোলও পালটে গেছে।

অন্যদিন পুলক বোস নিজের এলাকায় ফিরে আসার আগে ফ্লোর ম্যানেজারের অফিসঘরের বাঁয়ে আরেকটু এগিয়ে যায়। ওদিকটাতেই হোটেলের প্লাম্বিং ঘর। জল তোলার মেশিন। এয়ার-কণ্ডিশনারে জল সার্কুলেশনের বিশাল বিশাল পাইপলাইনের শুরু। আজ আর সেদিকে গেল না। যেতে পারল না পুলক।

সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে পুলক টানা লম্বা ফাঁকা করিডরে দেখতে পেল—শুধু একজন লোক দূরে পেছন ফিরে কিচেনের দৈত্যপ্রমাণ এগজসট মেশিনের সামনে দাঁড়িয়ে খুটখাট কী করে চলেছে। মাথাটি ক্রুকাট। মেশিন ঘরের স্কাইলাইট থেকে আলো ঝুলে পড়ে তারই গায়ে আলো দিচ্ছে। তার পায়ে পুলকের খুব চেনা খেলোয়াড়ি শু। লাইন টানা শ্লেট রঙের হাফহাতা গেঞ্জি ট্রাউজারের ভেতর গুঁজে পরা। কোমরে বেল্ট। এবার লোকটি ঝুঁকে পড়ে কী যেন নেড়ে-চেড়ে দেখছে মেশিনে।

সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে লোকটিকে পেছন থেকে দেখতে দেখতে পুলক বোস সেখানে দাঁড়িয়েই গেল। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, রোজ দেখা হচ্ছে— অথচ একবারও বলেনি। আশ্চর্য ?

আরও আশ্চর্য হওয়ার ছিল পুলকের। সে দেখল—লোকটি এবার ফাঁকা করিডর ধরে কোন্ একটা অজানা সুরে—যে-সুরের কোন শব্দ নেই—লোকটি একাই শুধু তা শুনতে পাচ্ছে—সেই সুরে আপন মনে কয়েক পলক জগিং করে নিল। নিয়েই সামনের দিকে খানিক দৌড়ে এল। এসেই থেমে পড়ে বাঁদিকে কাত হল একবার। আরেকবার কাত হল ডানদিকে। বডি ফিট রাখার কসরতকে এভাবে একেবারে একটা নাচ করে তোলা কখনও পুলক দেখেনি।

এবার লোকটির মুখ দেখা গেল। হলিডে-ইনের মেশিন ঘরের অপারেটিং সুপার তুষার সরকার। ফাঁকা করিডরে এখন শুধু সে একা। তার পেছনে কোন ব্যাণ্ড নেই। নেই পিয়ানো, চেলো বা কর্নেট কোন বাজনাই নেই। সেই নিঃশব্দ সুর শুধু তুষার সরকারই শুনতে পাচ্ছে একা। তাই একাই সে খানিক স্পট জগিং, জগিং আর আগুপিছু ডবল হাফ দৌড় মিশিয়ে তাতে তাল মিলিয়ে নিচ্ছে। সরু ফাঁকা করিডরের দু'পাশে—মাথার ওপর শুধুই মোটা মোটা জি আই পাইপের গহন জঙ্গল যেন—সব ছ'ইঞ্চি ডায়ামিটারের—তাদের স্টপ কর্ক—ঘোরানো চাকার স্টার্টার—কত কী!

পুলক মনে মনে বলল, একজন অপারেটিং সুপারের নাচের এই তো আইডিয়াল জায়গা!

হোটেল হলিডে-ইনের বাইরের দেওয়ালের বয়স একশ বছরের ওপর। ভেতরটা ফি-বছর বদলাতে বদলাতে এখন চেহারা একদম হালফিলের। তবে আলোর ঝাড়গুলো সেই আগেকার। বেসমেণ্টে কিচেন, মেশিনঘরের লাগোয়াই হলিডে-ইনের একদম নিজের বেকারি। সেখানকার লোফ ব্রেড একসময় ভোরের ট্রেনে ধানবাদ, চক্রধরপুর অব্দি সাপ্লাই যেত। আর কেক্? সে তো ফ্লুরির সঙ্গে একসময় পাল্লা দিয়েছে।

সেই বেকারির ওভেন থেকে বেরনো ভাজা ভাজা ইস্টের গন্ধটা বড় প্রিয় তুষারের। এই মেশিন ঘরে হোটেলের বাইরে যে কলকাতা—তার কোন আওয়াজ বা ধুলো এখানে ঢুকতে পারে না। মেশিন ঘরের ভেতরে ওই গন্ধ দিয়ে রোজ তুষারের নিজের একটা পৃথিবী তৈরি হয়ে যায়। সেই পৃথিবীতে সে এখন একা। জগিং করো—দৌড়োও—কেউ বাধা দেবার নেই। শরীরটা একদম পায়রার পালক। বুকটা চ্যাটাল। বেল্টের বাঁধনে কোমরটা সরু। দু'খানি পা স্পোর্টিং পিস্টন।

তুষারের মনে হল—শরীরে এত মজা! আমি বোধহয় আরও দেড়শ বছর এমনই থাকব। আমি যে হাঁটি—আমার তো মনে হয়

আমার পায়ের নিচের মাটি আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে।

ঠিক এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। ফাঁকা মেশিন ঘরের ভেতর সেই আওয়াজ যেন বা দমকলের কোন টয়গাড়ির হুঁশিয়ারী। অবশ্য পাবলিক বলতে ওখানে তুষার সরকার একা। টেলিফোনটাকে আরও খানিকটা বাজতে দিয়ে সে দূর থেকে দু'হাতে তার নাচের অদৃশ্য সঙ্গিনীকে আলতো করে ধরে সুরেলা ডবল হাফে এগিয়ে এল। আধখানা জগিং—আধখানা দৌড়নোর ভঙ্গিতে। তারপর রিসিভারটা তুলল তুষার।

হ্যালো ?

কে ? সরকার বলছেন ?

ইয়েস স্যার। আমি তুষার—

সুইমিং পুলে রিচেক করেছেন ?

ইয়েস স্যার।

আজই সন্ধে সন্ধে অস্ট্রেলিয়ার টুরিস্ট দলটা এসে পেঁছিবে। এসেই ওরা নির্ঘাত জলে নামবে—

নামুক না। সবকিছু ও কে স্যার।

জলের টেম্পারেচার ?

সেই জলই ছাড়া হবে স্যার—যা ওদের ভাল লাগবে।

তবু একবার ড্রেইনেজটা দেখুন।

দেখেছি স্যার।

আমি বলছি—দেখুন। বিশেষ করে ব্যাংকোয়েট হলের ডানদিকে নিচে—রিসেপশন কাউণ্টারের তিন মিটারের ভেতর একটা পাইপ গেছে। ওটা কোথাও কোথাও গোলমাল করে—রিচেক করাই ভাল।

ইয়েস স্যার।

কয়েক মিনিটের ভেতর ওভারঅল পরে তুষার সরকার বিশাল রিসেপশন কাউণ্টারের সামনে হাজির হল। তার দু'পাশে দুজন হেল্পার। তিনজনের হাতেই জায়াণ্ট রেঞ্জ, লোহার চেন। তুষারের ডানপাশের হেল্পারের হাতে একটি চৌদ্দ পাউণ্ড হাম্বার। পাইপের

জোড় খুলতে রেঞ্চ লাগিয়ে তার মাথায় এই হাম্বার মারতে হয়।

রিসেপশন কাউণ্টারে ঘিয়ে সাদা স্যুট পরনে মাত্র একজন যুবকই দাঁড়িয়ে। ঠিক রুম সার্ভিসের ডেস্কে। তার ডানদিকে চারটি মেয়ে। বাঁদিকে পাঁচটি। মেয়েরা সবাই হলিডে-ইনের ইউনিফর্ম শাড়ি পরেছে। বহু উঁচু থেকে কন্সিলড ল্যাম্পের চাপা আলো এসে সবারই শাড়ির সবুজ জমিতে পিছলে পড়ছে। শাড়ির মেরিগোল্ড রঙের পাড় আর ব্লাউজের বাইরে বেরিয়ে থাকা সবক'টি মেয়েই বেশ লম্বা, স্লিম তার তীক্ষ্ম। হলি ডে-ইনের ম্যানুয়াল মত সবারই রূপটান একই ধাঁচে। সবুজ বিন্দিয়া। বাঁদিকে সবশেষে ছিমছাম রিসেপশনে এই তিনমূর্তিকে উদয় হতে দেখে তপতীর ভ্রূ কুঁচকে গেল। সে আনমনা হয়ে অজান্তেই বাঁহাত দিয়ে দেখে নিল কাঁধের ওপর ব্রোচে আটকানো শাড়ির চারথাক পিলেট ঠিকঠাক আছে কিনা।

তুষার এগিয়ে এসে ঘুরে রিসেপশন ডেস্কের ভেতরে গেল। সঙ্গে হাম্বার হাতে সেই হেল্পার। ম্যাডাম—একটু সরে বসতে হবে—

তপতীর কলিগ কল্পনা পালিত চমকে উঠল. এখানে? এখানে কী তুষার?

নাম ধরে ডাকলেও তুষার তাকে আলাদা করে রেকগনাইজ করল না। বলল, ম্যাডাম। দুটো টাইল সরিয়ে একবার দেখব—পাইপগুলোর জোড়ে কোথাও লুজ আছে কিনা—

হাই টুলটা সরিয়ে দূরে নিয়ে গিয়ে তার ওপর বসল কল্পনা। দুই হেল্পার খুব সাবধানে একটার পর একটা টাইল তুলে তুলে এগোতে লাগল। ফ্লোরে প্রায় শুয়ে পড়ে। যাতে কিনা রিসেপশন কাউণ্টারের পেছন ডেকে তাদের দেখা না যায়। আর তাদের পেছন পেছন তুষার সরকার। গম্ভীর। স্রেফ কাজওয়ারি মুখের চেহারা। ফ্লোরের এক চৌকো থেকে আরেক চৌকোয় যাতায়াত প্রায় বেড়ালের থাবায় ভর দিয়ে—কোন শব্দ নেই—এত অনায়াসে। তুষারের শরীরটাই যে পায়রার পালক।

একটা করে টালি খুব সাবধানে তোলা হয়! চেক করে ফ্লোরে শুয়ে পড়ে হেল্পারদের একজন রেঞ্জ ঠুকে বলে, ও কে। সঙ্গে সঙ্গে মেঝেতে আধোশোয়া অন্য হেল্পার বলে ও কে। তাতে তুষার বাঁদিকে হেলিয়ে মাথা নড্ করে। এইভাবেই তিনজনের দলটা শুয়ে পড়ে—হামাগুড়ি দিয়ে—দাঁড়িয়ে এগোতে এগোতে তপতী দত্তর কাছে এসে পৌঁছাল।

একজন হেল্পার বলল, মাদাম একটু সরতে হবে—

রীতিমত বিরক্ত মুখে তপতী বলল, এখানেও ?—বলতে বলতে সে তার হাই টুলটা খানিক সরিয়ে নিল।

তুষার যেন কোন মেশিনের সঙ্গে কথা বলছে—এই ভঙ্গিতে বলল, কয়েক মিনিট মাত্র লাগবে—

তপতী এ কথার কোন জবাব দিল না। বিশাল রিসেপশন কাউণ্টারের সামনে আরও অনেক বড় ফাঁকা জায়গা। চাপা রঙিন আলোয় বোঝার উপায় নেই এখন দিন কি রাত। খোলা সিংহদরজা দিয়ে দেখা যায়—সাজানো গাছপালার ভেতর পাথর বসানো সুইমিং পুলের নীলচে বুক। রিসেপশনের অন্য মেয়েরা যে যার ডেস্কে ব্যস্ত। লোকজন আসছে যাচ্ছে। সবাই এত আস্তে কথা বলে যে কিছুই শোনা যায় না।

হেল্পার দুজন তপতীর দাঁড়াবার জায়গায় দুখানি টালি আলতো করে খুলে ফেলল। ঠিক এইসময় তুষার তপতীর দু'ফুটের ভেতর দাঁড়িয়ে চাপা গলায় বলল, কাল সন্ধেবেলা এল নাইনে করে কোথায় যাচ্ছিলে ? আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে। তুমি জানলার পাশে বসেছ। সোমা কোথায় ছিল তখন ?

তপতী দাঁতে দাঁত চেপে কয়েকটা ধারাল ছুঁচ বের করল মুখ থেকে। তুষার শুনল,—তপতী বলছে, ওই বাসের নিচেই চাপা পড়লে না কেন ? কত লোক তো রান-ওভার হয়।

একথা গায়েই মাখল না তুষার। সে ফের জানতে চাইল, সোমাকে দেখলাম না তো। মায়ের কাছে রেখে বেরিয়েছিলে ?

আমার সঙ্গে এমন কুকুরের মত কথা বলার চেষ্টা করবে না।— আমার মেয়ে সোমাকে তুমি আর দেখতে পাবে না।

আগের মতই গম্ভীর, সরল মুখে আর তন্ময় চোখে তুষার বলল, কুকুররা খুব সিনসিয়ার হয়। সোনালি এখনও তোমার জন্যে কাঁদে— আর সোমা আমারও মেয়ে।

তুমি একটা আসল কুকুর। সোনালির সঙ্গেই সারাজীবন থেকে যাও। সোমাকে দেখার চেষ্টাও করবে না।

তেমনি সিরিয়াস চোখে খুব চাপা গলায় তুষার সরকার ফের মুখ খুলল। সোনালিরা অতদিন বাঁচে না। আমি যে এখনও দেড়শ বছর আছি—

উঃ! এত লোক বাস চাপা পড়ে—বলেই তপতী প্রায় হিস্‌হিস্‌ করে উঠল। ডিভোর্স হয়ে যাবার পরেও এত কথার কী আছে?

ঠিক তখনই ফ্লোরে শুয়ে পড়া হেল্পারটি বলল, জোড়ের একটা টি কিছু লুজ্‌—

সঙ্গে সঙ্গে দুই হেল্পারকে দু'পাশে সরিয়ে দিয়ে তুষার সরকার নিজেই ফ্লোরে হামাগুড়ি দিয়ে উপুড় হয়ে পড়ল। জয়েণ্টে লোহার চেন বেঁধে ফেলে হেল্পারদের বলল, ঘোরাও—

হেল্পাররা ঘোরাচ্ছে। হঠাৎ মাথা তুলেই তুষার খানিক দূরে তপতীকে হাইটুলে পা ঝুলিয়ে বসে থাকতে দেখল। সঙ্গে সঙ্গে তার সব মনে পড়ে গেল। কোমর। দাঁড়াবার ভঙ্গি। তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে তপতী যখন চুমু খেত—তখনকার তপতীর বাঁ হাতের ল্যাটিসডরমাস—পিঠ—তাতে ঝুলেপড়া বেণী।

সে তপতীর গলা পরিষ্কার শুনতে পেল—

হোক্‌ না তুমি ম্যারেড—

তপতী। আমার একটি মেয়ে আছে। ক্লাস ফোরে পড়ে—

থাকুক না মেয়ে। সে তো আমারও মেয়ে।

মহুয়া যদি ডিভোর্স না দেয়—

আমাদের ভেতর কোন খাদ না থাকলে মহুয়া কী করবে! তাকে

ডিভোর্স দিতেই হবে তুষার।—বলতে বলতে তপতী তার চোখে চুমু খেল।

আমি বেশি দূর পড়িনি কিন্তু। তোমার মত শেকসপীয়র, টেবল্ ম্যানার্স—কিছুই জানি না।

যা জান তাতেই হবে আমার। দেখি। মাথাটা নামাও। যা ঢ্যাঙা—

আমি গ্র্যাজুয়েট নই। টেকনিক্যাল স্কুল থেকে বেরিয়েই হলিডে-ইনে আছি। বাবার প্লাম্বিংয়ের বড় দোকান ছিল একসময়। ওবেরয়দের আমল থেকেই বাবা এখানে সাপ্লাই দিতেন।

আঃ। চুপ করবে? এই সময় কেউ এত কথা বলে? কিচ্ছু জানে না।

সত্যিই তো জানি না। বড় সাহেবের সঙ্গে কথা বলে আমায় এখানে ঢুকিয়ে দেন বাবা।

আর কথা বলতে পারেনি তুষার। তার ভেতরে তখন আহ্লাদ আর আনন্দ হাত ধরাধরি করে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

পাঁচ প্যাঁচ ঘোরাতেই দুই পাইপের জয়েনার টাইট। তুষার উঠে দাঁড়াল। তখনও তপতী দত্ত হাইটুলে বসে স্ট্র্যাপ আঁটা জুতোশুদ্ধু পা দোলাচ্ছে। এখানে কোন গরম নেই। আলো চড়া নয়। সবাই বেশ সেজেগুজে বসে আছে।

তুষার সরকার জানে বাইরে বেরোলে তার প্রথমেই মনে হবে—কবে বৃষ্টি আসবে।

চার

গলফ্ ক্লাবের দেওয়াল ঘেঁসে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর আগে উদ্বাস্তুরা বসে গিয়েছিল। ঘাসজঙ্গল, বনবাদাড় কেটে। তখন এসব রাস্তায় লোক আসত না। খুন করে লাশ ফেলে দিয়ে যেত খুনীরা। সে সব লাশ জলা-জঙ্গলে ফুলে ঢোল হয়ে ভেসে উঠলে তবে পুলিশ

আসত। তবে দু'টি প্রাণী সবসময় এদিকে ঘোরাঘুরি করত। সাপ আর শেয়াল।

এখন তারা প্রায় নেই। উদ্বাস্তুদের সেকেণ্ড জেনারেসন—থার্ড জেনারেশনের মানুষজন এখন গলফ্ ক্লাবের গায়ের রাস্তায় বড় বড় বাড়ির বাসিন্দা। তারা বিকেলে খেলাধুলো করার জন্যে ক্লাবের দেওয়াল ভেঙে মাঠে নেমে পড়েছে। শান্তির জন্যে ক্লাব বাধা দেয়নি। অতটা ওদের লাগেও না আজকাল।

সব বাড়িই বড়সড় নয়। এখনও বাড়ির দেওয়াল চ্যাটাই বেড়ার। ছাদে টালি। রাস্তা থেকে দেখা যায় শ্যাওলা ধরা ফাটা বারান্দা। জংধরা বিকল টিউবওয়েল। জানলার নিচেই বনঝাল জঙ্গলে গোসাপ। অবশ্য সামনেই গলফ্ গ্রিন। রীতিমত ঝকঝকে।

এরকমই একটি বাড়ির টালির চাল বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটায় ধুয়ে ধুয়ে লাল থেকে আরও লাল হয়ে উঠছে। চালের নিচেই বারান্দায় বসে ফ্রেমে আটকানো একখানি থামে ঝুঁকে আছে একটি বউ। গাছকোমর করে পরা ডুরে শাড়ির আঁচল বৃষ্টির ছাঁটে ভিজে যাচ্ছে। বাঁ পায়ের মুখোমুখি ডেঁয়ো পিঁপড়ে বারবার দল পাকিয়ে পায়ের আঙুল কামড়াতে আসছে। ইচ্ছে করলেই উঠে এসে পিঁপড়ে তিনটেকে থেঁতলে মেরে ফেলা যায়। কিন্তু ওঠার উপায় নেই। তাই বউটি খানিকক্ষণ অন্তর আন্দাজে পা সরিয়ে সরিয়ে বসছে—যাতে কিনা পায়ে না উঠে পড়ে পিঁপড়ে তিনটে। বউটির হাতে রঙিন পেন্সিল। থানের ওপর আস্তে আস্তে একটি ফুলেল লতা ফুটে উঠছে।

বছরের প্রথম বর্ষা কিছু এলোপাতাড়ি হয়ে থাকে। এদিকটায় যারা ভাগ্যের জোরে তুলনায় কিছু কম ভাড়ায় ঘর পেয়েছে—তাদের নিজের খরচাতেই চালের টালি পালটাতে হয়—টিউবওয়েল খারাপ হলে নিজের খরচেই ফের বসাতে হয়। পছন্দ না হলে এখুনি উঠে যাও। নতুন ভাড়াটে রেডি। উইদ্ অ্যাডভান্স।

ভিজে যাবে [illegible]য়ো। ভেতরে এসো।

ঘরের ভেতর থেকে যে মুখখানি জানলায় ভেসে উঠল—তার গালে দাড়ি। চোখে চশমা। যাকে বলা—সেই মহুয়া তার আঁকা থেকে চোখ তুলতে পারল না। এই টানটা সেরে নিই। আরেকটু—

ততক্ষণে তোমার গা ভিজে যাবে।

আরেকটু। আরেকটু সঞ্জয়।

বেশ। তাহলে ভেজো বসে বসে। আমি চা বসাচ্ছি।

আমার জন্যেও কোরো সঞ্জয়। চিনি কম দিও।

চিনি তো আছে। তুষারদা দিয়ে গেছে—

আঁকা থেকে চোখ তুলল মহুয়া, কখন দিয়ে গেল ?

তুমি বাড়ি ছিলে না। কাল দুপুরে। তুমি তখন কাজ জমা দিতে বেরিয়েছ। আমি আর শিখা ছিলাম। বললেন, চিনির দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। এটা রেখে দাও।

আঁকা থামিয়ে খোলা জানলা দিয়ে ঘরের ভেতরে তাকাল মহুয়া। দুখানি ঘর। আর এই বারান্দা। ছোটখানি শিখার। তার পাশেই রান্নাঘর। আরও একঘর ভাড়াটে আছে। তাদের পাকা ছাদ। আগের ভাড়াটে বলে মহুয়াদের সমানই ভাড়া। কিন্তু ফ্যামিলিতে কমন কলতলা, কমন বাথরুম। ওদের চেয়ে মহুয়াদের ইলেকট্রিকের জন্যে মাসে বারো টাকা বেশি দিতে হয়। পড়ুয়া মেয়ে আছে না।

সঞ্জয় মেঝেতে বসে স্টোভে তেল ঢালছে। রান্নাঘরের স্টোভটার চাতাল জং ধরে চুরচুর। জং ছাড়িয়ে রঙ করানো দরকার। নইলে যে কোন দিন কেরোসিনসুদ্ধু চাতালটা খুলে পড়তে পারে।

মহুয়া আস্তে আস্তে বলল, চিনিটা কমই দিও সঞ্জয়। পায়ের ব্যথাটা তো কমল না।

জুতোর ডিফেক্ট সারছে না।—ঘরের ভেতর থেকে কথা পাঠিয়ে সঞ্জয় জল চাপাল স্টোভে। এ মাসেই তোমায় কাপড়ের জুতো কিনে দেব। স্যাণ্ডেলে আসলে আমার পায়েও ব্যথা করে।

ফের আঁকা থামাতে হল মহুয়াকে। ডেঁয়ো পিঁপড়ে তিনটে কোথায় গেল ? বৃষ্টি ধরে আসছে। সামনেই একটা সুন্দর দোতলা

বাড়ির রেইনওয়াটার পাইপের নিচে দিয়ে গলগল করে ছাদ ধোয়া জল নেমে আসছে। দোতলায় বারান্দায় রঙিন জামাকাপড় পরে দু'টি বাচ্চা খেলছে। গলফ্ ক্লাবের মাঠের ভেতর ঠেলে দাঁড়ানো একটা কাঁঠালগাছ বৃষ্টিতে চান করে একদম পরিষ্কার।

আগে তোমার জুতো কিনো। অনেকটা যেতে হয়। সেই আগরপাড়া।

আমি তো বাসে বাসে চলে যাই। তবে হ্যাঁ—ডিপার্টমেণ্টে ডিপার্টমেণ্টে ঘুরতে হয়। খুব পুরনো বাড়ি। পুরনো কোম্পানি। অনেকদিন পরে খুলেছে তো। আমি বলছিলাম কি মহুয়া তোমারটাই আগে কেনা দরকার। তুমি তো হ্যারিসন রোডে নেমে ওই খারাপ রাস্তা দিয়ে হেঁটে যমুনালাল বাজাজ স্ট্রিট পেরিয়ে—

হয়েছে। চা করতে করতে অত কথা বললে চা খারাপ হয়ে যাবে।

ভালমতই শিখেছি। খারাপ হবে না। চিনি তোমারটা মিশিয়ে নিও মহুয়া—

সেই ভাল। ডাক্তার অন্যরকম সন্দেহ করছেন। বলছিলেন, ব্লাড সুগার বাড়লে পায়ে ব্যথা হয় এরকম। ব্লাডটা টেস্ট করতে বললেন।

চায়ের জল ফুটছে। সঞ্জয় দরজায় উঠে এল। কোন্ ডাক্তার দেখেছে?

জনসেবক সমিতির—

তেমনি ডাক্তার! এখন ব্লাড সুগার হবার সময় হয়েছে নাকি?

হয়েছে সঞ্জয়। মেয়েদের নাকি অনেক সময় আগে আগে হয়। তার ওপর আমি তো ফেব্রিকের কাজে সারাদিন যতক্ষণ আলো থাকে বসে বসে আঁকি।

তারপর যে হেঁটে হেঁটে কাজ পেঁছে দাও।

সে তো সঞ্জয় চার-পাঁচদিন পর একদিন খুব হাঁটা পড়ে।

চা ভেজাতে ঘরের ভেতর ফেরার সময় সঞ্জয় বলল, কত বয়স

হল তোমার ? এর মধ্যে ব্লাড সুগার হবে কী করে মহুয়া ?

হেসে ফেলল মহুয়া। তা হয়েছে। আমি সাঁইত্রিশে পড়ব এই আগস্টে --

সি টি সি ডাস্ট চা সঞ্জয় দেখে কিনে আনে। একেবারে চায়ের দোকানের গুঁড়ো চা নয়। ভেজানোর সময়টা—নিয়মটা সে দোকানীর অ্যাডভাইস ফলো করে চলে। মহুয়া আর সে—দু'জনেই চা খেতে ভালবাসে। শিখা খায় দুধ। তার দুধও সঞ্জয় ভোর ভোর লাইন দিয়ে বুথ থেকে ধরে আনে। ওখান থেকে কিনলে দাম লিটারে পঁচাত্তর পয়সা কম।

সাঁইত্রিশে পড়বে ? এই তো সেদিন আমাদের বিয়ে হল মহুয়া। তোমায় দেখে কিন্তু কেউ সাঁইত্রিশ বলবে না। বড়জোর একত্রিশ বত্রিশ—

নাঃ! তুষারের চেয়ে আমি ঠিক ছ'বছরের ছোট। তোমার চেয়ে আমি বড় চার বছরের—একটু থামল মহুয়া। তারপর বলল, তুমি আর তপতী ঠিক এক বয়সী।

দু'কাপ চা সাবধানে মেঝেতে নামিয়ে দিয়ে সঞ্জয় একটা বাটিতে সামান্য চিনি আর একটা চামচ নিয়ে ফিরে এল। এসে ঘর থেকে একটা মোড়া টেনে বসল, মিশিয়ে নাও ইচ্ছেমত।

চায়ে চুমুক দিয়ে মহুয়া বলল, বেশ ভাল করেছ তো। এখন একটু চা না খেলে মাথাটা খোলে না।

যে কথা কোনদিন সঞ্জয় জানতে চায়নি আজ তা নিয়ে ফস করে কথা বলে ফেলল। বৃষ্টিতে ধুয়ে গিয়ে আশপাশের রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, গাছপালা ঝকঝকে তকতকে দেখাচ্ছে। চাই কি রোদও বেরিয়ে পড়তে পারে মেঘ কাটিয়ে। এখন দুপুর বেলা। শিখা বাড়ি নেই। সমর স্যারের কাছে পড়তে গেছে। পাড়ার পুরুষরা যে যার কাজে বেরিয়েছে। আষাঢ়ের এই সময়টায় অনেকদিন বিকেল বিকেল একটা লোক দু'তিনটে ইলিশ মাথার ওপর ডালায় করে ফিরি করতে আসে। আজ এলে ঠিক কিনবে সঞ্জয়। ইলিশ ভাজা

কাঁচালঙ্কা আর নুন দিয়ে খেতে ভালবাসে মহুয়া।

আচ্ছা মহুয়া—তপতীকে দেখতে কেমন।

চায়ে এক চুমুক দিয়ে কাপটা মেঝেতে নামিয়ে দিয়ে ফের পেন্সিল ধরেছিল মহুয়া। একটি বোঁটায় গুটি তিনেক পাতার মাঝখানে একথোকা ফুল। বোধহয় বোগেনভেলিয়ার লতানে ফুল পাতা আঁকছে মহুয়া। সেই সকাল থেকে। আজ বোধহয় চানও করার সময় পায়নি। মাকে আঁকতে দেখে শিখা নিজেই স্টোভে খিচুড়ি চাপিয়ে দিয়ে সবাইকে খাইয়ে নিজে খেয়ে তবে বই খাতা হাতে বেরিয়েছে। চান না করলেও ডুরে শাড়িতে মহুয়ার এই আটপৌরে ভঙ্গিটা বেশ ভালই লাগছে সঞ্জয়ের। এক এক সময় সঞ্জয়ের মহুয়াকে দেখে মনে হয়—এই আমার বউ? সত্যি! দেখে দেখে তার বিশ্বাস হয় না। পারলে দু'হাতে চোখ ডলে নেয়।

পেন্সিলটা পাশের মোড়ায় রেখে ফের কাপটা তুলে নিল মহুয়া। তপতী? ভালই দেখতে। আলাদা একটা চটক আছে। তার ওপর ভাল স্কুলে পড়েছে। বাবার অবস্থা ভাল। গ্র্যাজুয়েট। আমাদের বাড়িতে তো ও নিজেই আসত গোড়ায় গোড়ায়—

আমাদের?

চায়ের ঢোক যেন গলায় আটকে গেল মহুয়ার। মানে তুষারের বউ যখন আমি। অয়ারলেসের মাঠের গা দিয়ে সরু রাস্তাটা যেখানে কুদঘাটের সিমেণ্ট ব্রিজে মিশেছে—সেখানে—এখন যেখানে সোনালিকে নিয়ে তুষার আছে।

চশমার পেছনে সঞ্জয়ের চোখ কেমন ঘোলাটে লাগল মহুয়ার। সে হেসে এক চুমুকে চা শেষ করে কাপটা মেঝেতে রাখল ঠক করে। এ কথায় মন খারাপ করলে চলবে কেন সঞ্জয়? কথাটা তো সত্যি। আমার কুড়ি বছর বয়সে তুষারের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। ওর তখন ছাব্বিশ। বিয়ের পরের বছরই শিখা জন্মাল। এখন তো আমি তোমারই বউ সঞ্জয়।

একথা বলেও মহুয়া সঞ্জয়ের খুব কাছাকাছি হতে পারল না।

মানে যতটা কাছাকাছি সে হতে চাইছিল। মহুয়া দেখল, তারা দু'জনই খোলা রাস্তার সামনে বসে আছে। সবে বৃষ্টিটা থামল।

সে কথায় একদম না গিয়ে সঞ্জয় জানতে চাইল, কেমন দেখতে ছিলেন বিয়ের সময় ?

কার কথা বলছ সঞ্জয় ? তুষার সরকার ? মানে ওসমান খাঁ ?

মাঝেমধ্যে তুষারদার কথা উঠলে তুমি ওকে ওইনামে ডাক। অথচ তিনি সামনে থাকলে—বা শিখার সামনে কখনও ও নামটা তোল না। কেন মহুয়া ?

হো হো করে হেসে উঠল মহুয়া। আমি তো তপতীর কথা উঠলে তাকেও আয়েসা বলি।

হ্যাঁ। তাই বা কেন বল ?

কেন ? সেকথা একদিন বলব।

এখনই বলো মহুয়া। আমার কোন টেনশন ভাল লাগে না।

এমনি বলি। এর ভেতরে কোন রহস্য নেই সঞ্জয়। বঙ্কিম পড়নি ?

না। পড়িনি। এর ভেতরে নিশ্চয় কিছু আছে। তুমি বলতে চাইছ না।

সত্যি কিছু নেই। ওদের বিয়ের পরেও আয়েসা মাঝে মাঝে আসত। আমি তখন শিখাকে নিয়ে এখানে উঠে এসেছি। শিখা নিচের ক্লাসে পড়ছে।

একা এসে বাড়িভাড়া করলে ?

তুমি যে পুলিশের জেরা শুরু করলে সঞ্জয়। এরপর অন্ধকার নামলে আঁকতে পারব না আর।

না না। জেরা করব কেন ? বলো না—

আমি তো আয় করি না। টাকা পাব কোত্থেকে ? ওসমান খাঁ নিজেই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। তুমি তো সবই জান। সেই থেকেই তো তোমার আসা-যাওয়া।

ঘরের দালালিতে সেই আমার হাতে খড়ি মহুয়া। তখন কি

জানতাম—যার জন্যে ঘর খুঁজে দিচ্ছি—তারই ঘরে উঠে আসব একদিন। তুষারদার কাছ থেকে পুরো দু'মাসের ভাড়া দালালি গুনে নিয়েছিলাম। তুষারদাই আমাকে পাঠাতেন তোমার কাছে—যাও তো শিখা ওরা কেমন আছে দেখে আসবে। যাও তো এই টাকাটা মহুয়ার হাতে দিয়ে আসবে—

নাও থামো এবারে। অন্ধকার নামলে। কিছুই দেখা যাবে না।

ঘরে বসেও যে আঁকবে তার কোন উপায় নেই মহুয়া। এত লো-ভোল্টেজ এ পাড়ায়—

বেরচ্ছ? লাহা-তে নেমে আমার জন্যে কয়েকটা রঙ কিনবে কিন্তু।

না বেরিয়ে উপায় কী? এতদিনের পুরনো সিগারেট কোম্পানী ফের খুলেছে।

পয়সা দেব?

না। আমার কাছে আছে। কী কী রঙ লাগবে?

অসুবিধে হবে না?

কিসের অসুবিধে! লাহা কোম্পানির সামনেই তো ধর্মতলায় বাস থেকে নামব। ওখান থেকে সোদপুরের বাস ধরার আগে রঙগুলো কিনে নেব। ফিরতে ফিরতে কিন্তু সেই রাত বারোটা।

অত রাত কোরো না লক্ষ্মীটি।

উপায় নেই মহুয়া। লাস্ট বাসে ধর্মতলা। সেখান থেকে যা পাই। বলে আয়নার সামনে মাথা আঁচড়াতে আঁচড়াতে সঞ্জয় জানতে চাইল, বিয়ের সময় তোমার ওসমান খাঁ দেখতে কেমন ছিলেন?

কার সঙ্গে বিয়ের সময়?

আঃ! একটা কথা বোঝো না। আয়েসার সঙ্গে বিয়ের কিছু পর থেকেই তো ওসমান খাঁকে আমি ভাল করে চিনি। দো বেলা দেখছি। তখনই তো তোমার জন্যে এ বাড়ির দরকার পড়ল।

তাই বল আমার সঙ্গে? সে তো অনেকদিন আগের কথা। কিছু মনে নেই।

খুব মনে আছে। খাটে বসে শু-এর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে সঞ্জয় প্রায় ছোট ছেলের মতই বায়না ধরল, আহা! বলোই না।

মনে পড়ুক। পড়লে আরেকদিন বলব।

সঞ্জয় জানে এরপর আর কিছু বলানো যাবে না মহুয়াকে দিয়ে।

তার বউ বড় একগুঁয়ে। এই একগুঁয়েমিতে মহুয়া তার চোখে আরও সুন্দর হয়ে ওঠে। কেমন একটা বেশি বেশি টান বোধ করে সঞ্জয়। যেন মহুয়ার সাধারণের চেয়ে শক্তি অনেক বেশি। পাশ থেকে মহুয়ার মুখ দেখলে তাই মনে হয় সঞ্জয়ের।

পাঁচ

গলফ্ ক্লাবের দেওয়ালকে দেখে সঞ্জয়ের মন বলল, এটা কি চীনের প্রাচীরের চেয়েও বড়। সেই কোথায় শুরু। আর কোথায় গিয়ে শেষ। আগে তো আরও বড় ছিল। ক্লাবের বিশাল জায়গা থেকে খানিকটা কেটে নিয়ে গলফ্ গ্রীন তৈরি হয়েছে।

ভাঙা পাঁচিলের ভেতর দিয়ে সঞ্জয় মাঠে ঢুকল। বৃষ্টির সময় গলফ্ খেলা বন্ধ থাকে। আর সারাটা মাঠ নিয়েও ওরা গলফ্ খেলে না। আঁশফল, কাঁঠাল, আম, জাম, গুলমোহর গাছের ছড়াছড়ি। অবশ্য সবই বুড়ো গাছ।

সারাটা মাঠ উঁচু নিচু। ঢেউ হয়ে উঠে গিয়ে ঢিবিমত। আবার গড়ানে নেমে গিয়ে নিচু। এ রকমই মাঠ হয় গলফের। যেসব দিকে উঁচু সেদিক ধরেই সঞ্জয় হাঁটতে লাগল। ঢালুতে জল জমেছে বর্ষার। এ পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে শর্টকাটে সে গিয়ে পড়বে গলফ্ ক্লাব রোডে। সেখান থেকে দমদম পার্কের মিনিবাসে শেয়ালদা। ওখানে একটার পর একটা বাস সোদপুর, কামারহাটি, আগরপাড়া, ডানলপ যাচ্ছে।

আকাশ আবার কালো হয়ে এল। মহুয়া যতক্ষণ পারে আলো না জেবলে থানের ওপর ছবি আঁকবে। একে পায়ের নিচে ব্যথা

সারছে না—তার ওপর চোখেরও বারোটা বাজাচ্ছে।

হাঁটতে হাঁটতে অনেকগুলো কথা একসঙ্গে হুড়মুড় করে সঞ্জয়ের মনের ভেতর আছড়ে পড়ল। তার নিজের মনের ভেতরের সেই সব কথা সে যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। শুনে সে হাঁটতে হাঁটতেই হাসছে। গম্ভীর হচ্ছে। আবার ভাবছেও। আসলে এই গলফ্ ক্লাবের চড়াই উতরাই মাঠ, গলফ্ ক্লাবের ভাঙা দেওয়ালের গায়ের নির্জন রাস্তা, মেঘে কালো হয়ে আসা বর্ষার বিকেল—সবই যে-কোন মানুষকে একা করে দেয়—ভাবায়।

তোমায় যেন কোথায় দেখেছি? মনে করতে পারছি না।

অয়ারলেসের মোড়ে চায়ের দোকানে সঞ্জয় বসে ছিল সেদিন। রবিবারের সকাল ছিল সেদিন। যারা বাড়ি খুঁজতে আসে—তাদের জন্যে বসে ছিল সঞ্জয়। বাড়ি দেখাতে নিয়ে যাবার আগে কুড়ি টাকা দিতে হবে। বাড়ি হয়ে গেলে একমাসের ভাড়া দালালি। অনেক সময় সেই দালালি তিন চার জনের ভেতর ভাগ করে নিতে হত। সব বাড়ির খবর তো একজনে রাখতে পারে না।

ভাড়াটেদের দরকারও নানা রকমের। বেশি অ্যাডভান্স নয়। সিকিউরিটি হলে পারব না। বাথরুম সেপারেট হতেই হবে। বাড়িওয়ালাদের সঙ্গে একই এণ্ট্রান্স হলে চলবে না।

ঢ্যাঙা মত ভদ্রলোক যেন একজায়গায় দাঁড়াতেই পারেন না। সব সময় ঘোড়ার মত পা বদলাচ্ছেন। একবার ডান পায়ে ভর দিচ্ছেন আবার বাঁ পায়ে ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়াচ্ছেন। তোমায় যেন কোথায় দেখেছি?

কত জায়গাতেই তো দেখে থাকতে পারেন। কত লোককে বাড়ি দেখিয়ে থাকি।

না। আমার খুব চেনা লাগছে।

সঞ্জয় কোন জবাব না দিয়ে কুদঘাটের একটা মিনির দিকে তাকিয়ে বলল, আপনাদের হোটেলে ফি মাসে দু'বার করে ফোন মুছে দিতে যেতাম—।

তাই বলো ও—বলে এমনই জোরে ঢ্যাঙা লোকটা তার হাত ধরল—সঞ্জয়ের হাত যায় যায়।

কোনরকমে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে সঞ্জয় বলল, একটা চা আর টোস্ট খাওয়াবেন ? খুব খিদে পেয়েছে।

আলবৎ। বলে বেঞ্চে বসে পড়েই ঢ্যাঙা বলল, আমি তুষার সরকার। একবার যে হলিডে ইন-এ ঢুকবে কোন কাজ করতে— তাকে আমি ভুলি না। তুমি তো আমাদের মেশিন ঘরের পাশের ফ্লোর ম্যানেজারের ফোন মুছে টুছে সুগন্ধী করে দিতে। তোমায় তিনি সঞ্জু সঞ্জু বলে ডাকতেন।

আমি সঞ্জয় ঘোষাল। যোগেশচন্দ্রে পার্ট ওয়ানে গাড্ডা খেয়ে আর পড়িনি। কলেজ ছেড়ে দিয়ে এখন পর্যন্ত এগারটা চাকরি করেছি। শেষে এই বাড়ির দালালি। জানেন, কোন কোন বাড়িতে বাড়িওয়ালাকে নয় তো তার বেকার ছেলেকেও দালালির খানিকটা দিয়ে দিতে হয়। নইলে সে বাড়ি পাওয়া যাবে না!

তুষারও চা টোস্ট নিল।

সঞ্জয় কড়া টোস্ট চায়ে ভিজিয়ে মুখে দিতে দিতে বলল, আপনার মেশিন ঘরের ফোনেও সুগন্ধী করে দিতাম। আপনি অত সিগারেট খান বলে গন্ধটা পাননি কোনদিন।

তাই ?—বলে হাঃ! হাঃ! করে তিনবার হেসে তুষার সঞ্জয়ের উরুতে একটা থাপ্পড় কষাল।

তাতে সঞ্জয়ের গ্লাস থেকে চা চলকে পড়ল।

'সরি' বলে তুষার একখানা কুড়ি টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে বলল, এক নয় দুমাসের ভাড়া তোমায় ব্রোকারেজ দেব। কিন্তু এক মাসের ভেতর বাড়ি চাই। একখানা বড় আর একখানা ছোটমত ঘর হলেও চলবে—

ফ্যামিলি মেম্বার ক'জন ?

দু'জন।

আপনার জন্যে ?

বলতে পার আমার জন্যে। এক মহিলা আর তার মেয়ে থাকবে।

আর্নিং মেম্বার কে ?

বলতে পার আমিই।

সঞ্জয়ের চোখ একথা শুনে অন্যরকম হয়ে যাওয়ায় তুষার সরকার ফের শুরু করল, আমিই ভাড়া দেব। আমার মেয়ে আর তার মা থাকবে।

বলুন আপনার বউ।

না সঞ্জয়। মহুয়া আর আমার বউ নয়। আমি ফের বিয়ে করেছি।

হরিদেবপুর-দমদম পার্কের মিনিতে এই সময় ভিড় থাকে না। জানলার গায়ের সিটে বসে ভিজে কলকাতা দেখতে দেখতে সঞ্জয় নিজেকে বলল, এসব তো প্রায় বছর চারেক আগের কথা।

শিখাকে নিয়ে মহুয়া গল্ফ ক্লাবের গায়ের এ-বাড়িতে উঠে এল। আমি দু'মাসের ভাড়ার টাকা দালালি পেয়েছি একসঙ্গে। ঢ্যাঙা লোকটার হাত দরাজ। ভাল একজোড়া কাবলি জুতো, দুটো রেডিমেড শার্ট আর ধর্মতলার ফুটপাথ থেকে মরা সাহেবদের দুটো ট্রাউজার কিনে কাটিয়ে নিলাম। মাথা আঁচড়াবার চিরুনি রাখি পকেটে।

কিন্তু নতুন কোন বাড়ি তো আর ভাড়া হচ্ছে না। হাতের টাকাও ফুরিয়ে আসছে। আমি এ-বাড়ি আর তুষারদার বাড়ির ভেতর যাতায়াত করছি তখন। আমি তুষারদা বলেই ডাকতে শুরু করেছি। ভাড়া সাড়ে চারশ, অ্যাডভান্স চার হাজার, কোন সিকিউরিটি মানি লাগেনি। ঢাকা বারান্দার সঙ্গে একখানা বড় ঘর। সিমেন্টের মেঝে। চাটাইবেড়ার দেওয়াল। সঙ্গে একটা ছোট ঘর। পাড়া মত। আবার পাড়ার বাইরে যেন বাড়িটা। সারা এলাকায় এমন ভাঙাচোরা বাড়ি আর একটিও নেই বলেই কি ?

যদি কারও জন্যে তুষারদা বাড়ি খুঁজতে বলে সেই আশায় গেছি। অনেকের সঙ্গে তো আলাপ পরিচয় আছে ঢ্যাঙার।

শীতকালের সকাল। অয়ারলেস পার্কের কাছাকাছি আগেকার ভাড়া নেওয়া বাড়ি। বেশ ভাল ফ্ল্যাট। পুরনো কায়দার। তুষারদার বউ হিসেবে মহুয়া যেমনি প্ল্যাণ্ট লাগিয়েছিল—তখনও তা ব্যালকনিতে ঝুলছে।

বেল দিলাম।

একজন বেশ স্মার্ট মহিলা বেরিয়ে এলেন।

মিস্টার সরকার আছেন?

ও তো বেরিয়েছে। মর্নিং শিফট।

ভাল করে তাকিয়ে দেখি। আমার চেনা। হলিডে-ইনের রিসেপশন কাউণ্টারে সাতটা টেলিফোন মুছে সুগন্ধী করে দিয়েছি কতদিন। বললাম, মিস্ দত্ত না—

হ্যাঁ। আমি এখন মিসেস সরকার। তুমি তো সঞ্জয়।

মাথা নিচু করে বলি, হ্যাঁ।

ও তোমার কথা বলেছে। বলতেই আমি চিনেছি। এখন আবার মিলিয়ে নিলাম।

চলে আসছি। ডাকলেন। শোনো। এই প্যাকেটটা শিখাকে দিতে পারবে?

কেন পারব না। ওদিক দিয়েই তো ফিরব।

তুমি থাক কোথায়?

কোথায় থাকি বলি কী করে? বলতে পারছিলাম না। কারণ, আমি তো তখন কোথাও থাকি না। অনেকদিনই থাকি না। বাবা, মা অনেকদিনই নেই। বাবার প্রথম পক্ষের ছেলে—আমার দাদা যোগেশচন্দ্র পর্যন্ত আমায় কলেজে পড়িয়েছিল। তার দোষ দিই না। পার্ট ওয়ানে গাড্ডা খেলাম। দাদা বলল, পথ দ্যাখো। নিজের খরচা নিজে চালাও।

সেই থেকে আমি আয় করে তবে খাই। খেয়ে রাস্তায় ঘুরি। টায়ার্ড হয়ে পড়লে যেখানে থাকি সেখানকার কাছাকাছি কোথাও শুয়ে পড়ি। একটু খুঁজে নিতে হয়। শীতকালে একরকম।

গরমে অন্যরকম। বর্ষায় একদম অন্য।

হরিদেবপুর-দমদমপার্ক মিনি পার্কস্ট্রিটের ট্রাফিকে আটকে গেল।

টিকিট ?

মহুয়ার দেওয়া পাঁচটা দু'টাকার কয়েনের একটা সঞ্জয় দিল। পুরনো অভ্যেসে ক'টা পয়সা বাঁচাতে ছোট একটা মিথ্যে বলল সে। হাজরা থেকে শেয়ালদা—

আপনি তো গল্‌ফ ক্লাব মোড় থেকে—

দেখতে পেয়েছ ? তাহলে আরেকটা দু'টাকার কয়েন নাও।

ট্রাফিক খুলে গেল। মনে মনে সঞ্জয় তার শীতকালের রাতে শোবার জায়গাগুলো পরপর সাজাল।

২৩ পল্লীর পাকা দুর্গামন্দিরের পেছনে দুটো বাড়ির মাঝের রোয়াক।

হরিশ পার্কের উলটোদিকের একটা পুরনো বাড়ির (এখন পুলিস কোয়ার্টার) গাড়ি বারান্দা।

এস এস কে এম হাসপাতালের এমারজেন্সির রুগীদের শোওয়া বসার সিমেণ্ট করা পাকা বেঞ্চ।

গরমকালে অন্যরকম। যেমন—

শেয়ালদা মেইনের টিকিট ঘরের সামনে ঢাকা চাতাল। মাথার ওপর সারারাত পাখা ঘোরে।

যুগান্তর হাউসের খোলা চাতাল। অনেকে শোয়।

ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে স্যার আশুতোষের পায়ে।

বর্ষায় সবচেয়ে ভাল তিনটি হোটেল। তিনটিরই সামনে ফুটপাথের ওপর বিশাল ঢাকা ছাদ।

গ্রেট ইস্টার্ন।

গ্র্যাণ্ড।

ফিরপো। এটি অনেকদিন হল আর হোটেল নয়।

সেদিন অনেক কষ্টে তপতীকে বলেছি, আমি কোথাও থাকি না।

লেক, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, গঙ্গা—নানান জায়গায় চান করি। বাথরুমও নানান জায়গায়। শীতকালে রোজ চান হয় না। তবে হ্যাঁ, নিমের দাঁতনে রোজ দাঁতন করি। মাথা আঁচড়াই। রাস্তায় ভাতের হোটলে বেঞ্চে বসে ভাত খাই। আমার একখানা সাবান আছে। টিউবওয়েল বা কল পেলেই ভাল করে হাত মুখ ধুয়ে মুছে ফেলি। আমার একখানা তোয়ালে আছে। সাবান—তোয়ালে—এক্সট্রা জামা কাপড়, চিরুনি, দাঁতন আমার সঙ্গে এই ঝোলায় রাখি।

মিসেস তপতী সরকার কোন কথা বলতে পারল না খানিকক্ষণ। শেষে খুব আস্তে জানতে চাইল, শোও কোথায়? ঘুমোও কোথায়?

নানান জায়গায়।

ওঃ! বুঝেছি।

শেয়ালদায় নেমে সঞ্জয় বাস ধরল। এবারও সে লাকিলি জানলার গায়ে একটা সিট পেল। তবে সিটটা প্রতিবন্ধীদের। এমন বৃষ্টির দিনে কি কোন প্রতিবন্ধী উঠবে?

এই শোনো—

অয়ারলেস পার্কের কাছে সেই বেঞ্চে বসে লেড়ো ডুবিয়ে চা গিলছি। বেলা আটটা ন'টা। এরই ভেতর রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে।

ও কী ডাকার ছিরি? আমি কি তোর বাবার চাকর?

মুখে এসব কথা এল না। তৈরিয়া হয়ে বললাম, কী বলছেন? এত ডাকাডাকি কিসের?

আরে শোনোই না।

কাছে গেলাম। কী বলছেন?

কাল রাতে কারা ঢিল ছুঁড়েছে—

অবাক হলাম ঢিল? কোথায়?

গল্‌ফ ক্লাবের মাঠের দিক থেকে। পর পর দু'বার। আমি ভোররাতে জগিং করতে করতে ওদিকে গিয়েছি আজ। দেখি মহুয়া চুপ করে একা বারান্দায় বসে আছে। সব বলল। শেষ রাত থেকে বসে আছে।

বৌদি বলল?

মহুয়া তোমার বউদি নয় সঞ্জয়। আমি তোমার তুষারদা ঠিকই। কিন্তু মহুয়া তো আর আমার বউ নয়।

ভুল শুধরে নিয়ে বললাম, ওই হল। তা কারা ঢিল ছুঁড়তে পারে? তাছাড়া ওপাড়ার ছেলেদের ওপর আমার তো কোন কণ্ট্রোল নেই। ওখানে বিশেষ কাউকে জানিও না যে বলতে পারি।

যেন এ-পাড়ার ছেলেদের ওপর আমার খুব কণ্ট্রোল আছে! আমি কে যে আমার কথা শুনবে? আমি হলাম গিয়ে একটা—বাড়ির দালাল। ফালতু। বাড়ি দেখাতে নিয়ে যাওয়ার ভিজিট নিই কুড়ি টাকা করে। রোজদিন পেমেণ্ট হয় না। এসব কথা তো বলা যায় না। চুপ করে থাকি।

তুষারদা বলল, শুনলাম তোমার তো তেমন কোন থাকার জায়গাই নেই। খাওয়ারও কোন জায়গা নেই। তুমি থাকো না ওখানে!

আমি? আকাশ থেকে পড়ি। মেয়ে নিয়ে একজন মেয়েছেলে থাকে। একদম একা। সেখানে আমি থাকব? আমার তো কিছুই জানেন না তুষারদা। বিশ্বকাপের সময় আমি আর্জেণ্টিনার। আই এফ এ-তে মোহনবাগানের। ব্যাটিংয়ে লারার দিকে। হাজরায় বড় বাথরুম পেলে সুলভ শৌচালয়। আমাকে থাকতে বলছেন?

হ্যাঁ। তুমি। তুমি সঞ্জয়।—বলতে বলতে তুষার সরকার আমার ডান হাতখানা জোরে চেপে ধরলেন। অন্তত রাতের বেলাটা। মনে কর একজন মহিলা বিপদে পড়ে তোমার সাহায্য চাইছে—

বেশ।

এই তো চাই। রিয়াল পুরুষের মত একটা কাজ করতে রাজি হলে তুমি। মেন ইন ডিসট্রেস দেখেও যারা দূরে সরে থাকে তারা কাওয়ার্ড!

মনে মনে বলি—এ জন্য তো তুমিই দায়ী তুষারদা।

দোবেলা দুটো স্কোয়ার মিল পাবে তুমি। চা বিস্কুট তো

আছেই। তাছাড়া চান বাথরুমের জন্যে তোমার একটা পার্মানেন্ট সল্যুশন হয়ে গেল। তোমার সঙ্গে কথা না বলেই মহুয়াকে আমি তোমার কথা বলে এসেছি। তুমি আমায় বাঁচালে সঞ্জয়।

এরপর সবই ছবির মত।

ছয়

কলিং বেলের আওয়াজ পেয়ে বিষ্ণু দত্ত দরজা খুলে দাঁড়ালেন। সদানন্দ রোডে এখন সব গাড়ি বি-বা-দি বাগের দিকে চলেছে। অফিস টাইম।

তুমি? এখন তো—বলে খোলা দরজা থেকে বিষ্ণু দত্ত সরে এলেন।

হ্যাঁ আমি তুষার। আমার মেয়েকে দেখতে এসেছি।

বিষ্ণু দত্ত চোখের চশমা খুলে বললেন, এখন তো সোমা নেই। স্কুলে পেঁছিতে গেছে তপতী।

কোন্ স্কুল? শীগগির বলুন। আমার মেয়েকে আমি অনেক-দিন দেখিনি। আমি সেই স্কুলে যাব।

ভেতরে ঘরের পরদা সরিয়ে যে-মহিলা ঘরে ঢুকল তুষারকে দেখেই তার ভ্রু কুঁচকে গেল। তিনি চাপা গলায় বললেন, বলে দাও দেখা হবে না। কোর্ট যেমন বলেছে—তেমনি হবে।

স্ত্রীর কথা মত বিষ্ণু দত্ত কিছুই করতে পারলেন না। তিনি ভুলতে পারছেন না—তাঁর নাতনী সোমার বাবা এই তুষার। তিনি শুধু বললেন, দ্যাখো তুষার। আমি রিটায়ার্ড। প্রেসারের রুগী। কোন টেনশন আমার সহ্য হয় না।

তুষার চেঁচিয়ে উঠল। তা বললে চলবে কেন? আপনি তো বেশ নিজের মেয়ে তপতীকে নিয়ে এসেছেন। নিজের কাছে রেখেছেন। আমিই বা আমার মেয়েকে দেখতে পাব না কেন?

কথা বললেন তপতীর মা। এখানে বা স্কুলে গিয়ে কোন সিন

কোরো না। এখন যাও। তোমার তো আরও একটি মেয়ে আছে। তাকে নিয়ে সোহাগ করোগে যাও—

আমি কী করব সে আমি বুঝব। আমি দুই মেয়েকে নিয়েই সোহাগ করব।

আমার বাপু এসব সয় না। তোমরা তো এখনও একই অফিসে আছ। সেখানে তপতীর সঙ্গে সোজাসুজি কথা বলে নেবে। এভাবে বাড়িতে এসে চড়াও হওয়া চলবে না।

মেয়ের মা হয়ে আপনিই গোড়া থেকে আমাদের বিবাহিত জীবনে নাক গলিয়ে এসেছেন। কলকাঠি নেড়েছেন। আপনি কোনদিনই আমাদের বিয়েটা মেনে নিতে পারেননি।

কিসের বিয়ে! এক বউ থাকতে—আর কথা বলতে পারলেন না অমলা। কান্না এসে গেল। আঁচলে চোখ মুছে বললেন, আমার অমন সোনার মত মেয়ে—ছোট মেয়ে—তাকে ভুল বুঝিয়ে বিয়ে করা —তার জীবনটাই—এ বয়সে এখন সে কী করবে একবার ভেবেছ ?

কোন অসুবিধে ছিল না। আপনিই আপনার মেয়েকে বুঝিয়েছেন—মহুয়ার সঙ্গে আমার গোপনে যোগাযোগ আছে। হুইচ ইজ আ ড্যাম লাই! এর ভেতর কোন সিকরেসি নেই।

এবার কমলাও ফুঁসে উঠলেন। তবে তুমি প্রায়ই যেতে কেন ? যাও কেন ? একদিনের জন্যেও যোগাযোগ না হয়নি তোমাদের। আমি সব জানি। আলাদা বাড়ি ভাড়া করে রাখা! আলাদা হবার ভান।

স্টপ। স্টপ বলছি। সেখানে আমার একটি মেয়ে আছে। মহুয়া আপনার মেয়ের মত চাকরি করে না। তাদের চলবে কিসে ? ফর হিউম্যানিটিজ সেক আমি তো যাবই। দেখবও। আপনি কী চান শিখাওরা না খেয়ে মরুক ?

তুমি এখন এসো।

বিষ্ণু দত্ত স্ত্রীর মুখের ওপর কোনদিন কোন কথা বলেন নি। বলতেও পারেন না।

তুষার চেঁচিয়ে উঠল, আমি চেয়েছিলাম—মহুয়া নিজের পায়ে

দাঁড়াক। শিখার এডুকেশন শেষ হোক। আমি আস্তে আস্তে সরে আসব। আমাকে আর ওদের দরকার হবে না। ওরাও আমাকে ভুলে যাবে।

দুদুটো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা! তাই না? আমার কাঁচ মেয়েটা কী দোষ করেছিল তোমার কাছে তুষার। তাকে ভোলালে কেন বলতে পার?

আমিও তো ভুলেছি। আপনার মেয়েও তো আমায় ভুলিয়েছিল। আমার কী ছিল না? বউ. মেয়ে, পার্মানেণ্ট চাকরি, থাকার জায়গা —হেলথ্। কোনটা আমার অভাব ছিল?

তুমি তো ভুলতেই ব্যস্ত। আমার মেয়েকে কেন মসজিদে গিয়ে আয়েসা হতে হল? কেন ডিভোর্স দেয়নি সে? তার জড়িয়ে থাকার কী দরকার—যখন সব চুকেবুকে গেছে?

তার কোন আর্থিক স্বাধীনতা নেই।

কী?—অমলা দত্ত ঝাঁকিয়ে উঠলেন।

সেদিকে তাকিয়ে তুষার বলল, আমার পরিচয়টুকু ছাড়া তার আর কিছু নেই। সেটুকুই সে আঁকড়ে থাকতে চেয়েছে। আপনি বোঝার চেষ্টা করুন। সবাইকে নিয়েই কি বাঁচা যায় না? বাস করা যায় না? সেও তো একজন মানুষ। !

এসব ন্যাকামোর কথা তপতীকেও বলেছ শুনেছি।

কথাগুলো একটাও মিথ্যে নয়। মহুয়ার বিয়েও দিয়েছি।

বাঃ! তোমার তো গুণের কোন ঘাট নেই।

বেঁচে থাকার জন্য আমরা সবাই—আমি-তপতী-মহুয়া—আমরা সবাই একসঙ্গে বাস করতে পারতাম। এ পৃথিবীতে কেউই ফেলনা নয়। কিন্তু আপনি তা হতে দিলেন না। আপনিই কলকাঠি নেড়ে তপতীকে উসকে কোর্টে তুললেন ব্যাপারটা।

তা তো বটেই! মহুয়াকে লোক দেখানো বিয়ে দিয়ে নিজের করেই রেখেছ।

মুখ সামলে কথা বলবেন। সে এখন অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী।

একা আর কত বদমাইসি চালাবে তুষার? সবদিক থেকেই তোমার সুবিধে। মহুয়াকে ডিভোর্স না করে তোমার তপতীকে বিয়ে করাটাই অসিদ্ধ।

মোটেই না। আমি মসজিদে গিয়ে ওসমান খাঁ হয়ে—

ওদিকে মহুয়া তোমাকে তালাক না দিয়েই ফের বিয়েয় বসেছে। সেই বিয়েটাও অসিদ্ধ। তোমারই সুবিধে সবদিকে—

ইউ বিচ্—বলতে বলতে বেরোনোর দরজায় একটা লাথি কষাল তুষার সরকার। তারপর স্পোর্টস-শু পায়ে এক লাফে নেমে যায় সিঁড়িতে। একতলা বাড়ি। সামনেই ফুটপাথ। সেখানে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল, আমি সোমার স্কুল খুঁজে বের করবই। দেখি তাকে কোথায় লুকিয়ে রাখতে পারে তপতী।

বর্ষা ক'দিন হয়। তারপর একদম চুপচাপ। সেরকম একটা টাইম যাচ্ছে। রীতিমত ভ্যাপসা গরম। গাড়ি, সাইকেল, ঠেলা পেরিয়ে তুষার প্রথমেই গেল তপন থিয়েটার পেরিয়ে বাঁ হাতের কিণ্ডারগার্টেনে। ওখানে বাচ্চাদের মায়েরা উলটোদিকের একটা বাড়ির বারান্দায় বসে গল্পগাচ্ছা করে। আজ তপতীর সন্ধ্যের শিফট। সোমাকে নিয়ে ওখানে গিয়ে থাকলে নিশ্চয় দেখতে পাব। তুষার ভেতরে ভেতরে জ্বলছিল। তপতীর মায়ের মুখখানি মনে আসতেই সে বেলা ন'টা-দশটার কলকাতায় চেঁচিয়ে বলে উঠল, ইউ বিচ্!

তপতীকে তার মা চালায়। এ বিশ্বাস তুষারের বদ্ধমূল। সে রাস্তায় হাঁটছে আর মনে মনে বিড় বিড় করে বলছে, সোমা সোমা সোমা। আজ তোকে পেলে আমি একদম নিয়ে যাব। আর কোনদিন তোকে ফেরত দেব না। বলতে বলতে নিজের মেয়ের নরম নরম আঙুলগুলো মনে পড়ল। একদম ছোট থাকতে সোমা তার কোলে উঠে কাঁধের কাছে খামছে ধরত—নরম নরম আঙুল দিয়ে—পাছে পড়ে যায়।।

হঠাৎ তুষার দেখতে পেল—একটা হাতটানা রিকশায় করে সোমা তার মায়ের পাশে বসে এদিকেই আসছে। শরীর খারাপ হল নাকি সোমার? না, স্কুল হঠাৎ ছুটি হয়ে গেল?

তপতীর পরোয়া না করে তুষার ছুটে রিকশার পাশে গেল। এই সোমা?

বাবা—আ—আ—বলে এক আদুরে ডাক ডেকে উঠল সোমা। দু'হাত তুলে। যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে রিকশার পাশে পাশে হাঁটতে থাকা তুষারের বুকে উঠবে।

তুষারকে গোড়ায় দেখতে পায়নি তপতী। কী ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ তুষারকে রিকশার পাশাপাশি হাঁটতে দেখে যেন ভূত দেখল। মেয়েকে জাপটে নিজের কোলে তুলে নিল তপতী।

রিকশাওয়ালা ভয় পেয়ে থেমে গেল। ক্যা হুয়া মাইজি? রিকশাওয়ালার সন্দেহ হবারই কথা। একজন প্যাণ্ট শার্ট পরা পুলিসের লোকের মত দেখতে লোক তার রিকশার পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করেছে। মাইজি তার বাচ্চাটাকে অক্ষতভাবে কোলে তুলে নিল। তপতীর ঝাঁকুনিতে সে রিকশা থামিয়ে ফেলেছে।

কিচ্ছু না। তুমি চালাও তো। জোরে চালাও—

এই ভিড়ে জোরে চালাবার কোন উপায় নেই। তুষার একবার দু'হাত দিয়ে সোমাকে কেড়ে নেবার চেষ্টা করল।

তপতী সোমাকে তুষারের হাতের বাইরে সরিয়ে নিল। নিয়ে চাপা গলায় বিষ ঢেলে বলল, খোলা রাস্তায় আর নাটক করতে হবে না। অনেক হয়েছে! অনেক—

ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজন অবাক হয়ে রিকশার পাশে হাঁটতে হাঁটতে তুষারের এই হাত বাড়িয়ে দিয়ে বাচ্চা তুলে নেওয়ার চেষ্টা—বার বার হাত বাড়ানো—আর পেরে না-ওঠা দেখে কিছুই বুঝতে পারছে না—আবার মজার গন্ধ পেয়ে দাঁত বের করে তারা হাসছেও।

তপতী হিস হিস করে উঠল। সোমা আমার। ওকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে দ্যাখো—তোমার হাত পুড়ে যাবে। তুমি অন্ধ হয়ে যাবে। গাড়ি চাপা পড়ে তোমার দুটো পা-ই কাটা যাবে—

যেন কিছুই হয়নি—এই ভঙ্গিতে রিকশার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে তুষার বলে চলেছে—তাতে তোমার বাবার হাত পুড়ে যাবে। সোমার বাবাই অন্ধ হবে। সোমার বাবারই পা কাটা যাবে। দাও। আমার মেয়েকে দিয়ে দাও—বলতে বলতে পাকা রানার তুষার সরকার জগিংয়ের ঢঙে ঘুরে গিয়ে রিকশার আরেক পাশে হাঁটতে লাগল—যাতে সহজেই সোমাকে টেনে কোলে তুলে নিতে পারে।

অমনি তপতী তার মেয়েকে অন্যপাশে সরিয়ে নিল। যাতে তুষার না নাগাল পায়। এবার রাস্তা খানিকটা ফাঁকা পেয়ে রিকশা-ওয়ালা প্রায় ছুটতে লাগল। সে তুষারের এমন দৌড়নো—ভারি গলায় চেপে চেপে তপতীর কথার পিঠে কথা বলে যাওয়ায়—রীতিমত ভয় পেয়ে গেল। রিকশার স্পিড বেড়ে যাওয়ায় তুষারও একরকম দৌড়তে শুরু করল।

কিন্তু তার আর দৌড়ানো হল না। শিখ গুরুদ্বারের দিক থেকে শিখ মেয়ে-পুরুষের একটা মিছিল চলেছে। সামনের দিকে কাচ ঢাকা গাড়িতে ডেডবডি। তপতীর রিকশা গলে বেরিয়ে গেল। তুষারকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। শবযাত্রার ভেতর দিয়ে গলে বেরনো যায় না।

তুষার দাঁড়িয়ে দেখতে পেল—রিকশা দিব্যি ছুটছে। আর মায়ের কোল থেকে পেছনের দিকে মুখ বাড়িয়ে সোমা যেন হাসছে। যতটা পারে সে তার বাবাকে দেখতে চায়। রিকশায় বসে বাবার দৌড়োদৌড়ি—আর মায়ের কথা বলা—সোমা যেন নতুন একটা খেলাই মনে করেছে।

নিরুপায় ভঙ্গিতে দু'পাশে দু'খানি হাত ঝুলিয়ে দিল তুষার। কালো দোপাট্টা মাথায় দিয়ে শিখ মেয়ে বউয়েরা চলেছে। তুষার কিছুতেই ভুলতে পারছে না—সোমার বাড়িয়ে দেওয়া দু'খানি

হাতের কাঁচ কাঁচ আঙুলগুলো। ঠিক আছে। কাল দেখা যাবে কাল আবার আসব।

সাত

তুষারদাকে কথা দিয়ে আমার সুবিধাই হল। আমি যেন নিমরাজি। এই ভাবটা দেখালেই আমার আদায় করতে সুবিধে হয়। রাতটা মহুয়াদের বাড়ি থেকে ওদের পাহারা দিচ্ছি—এই বলে তুষারদার কাছ থেকে টাকাও আদায় করতে পারি। চাই কি পার নাইট দশ টাকা। আসলে টেলিফোন মুছে মুছে অফিসবাড়িতে আমি কলকাতার নানান জায়গায় নানা রকমের মানুষ দেখেছি। তারপর বাড়ির দালালিতে নেমে বাড়ি দেখানোর জন্যে পার্টি পিছু কুড়ি টাকা করে পাওয়ার অভ্যেস হয়ে গেছে। আদায় করার একটা সুখ আছে। সব কাজেই। যেন আমি এই দুনিয়ায় গাইতে বসেছি। স্টেজে ওঠার আগে দক্ষিণাটা বুঝে নেওয়াই আমার স্বভাবে ঢুকে গেছে। আমি যেন কোন প্রখ্যাত কণ্ঠ শিল্পী।

আসলে তখন আর আমি ভাল ঘুমনোর জায়গা পাচ্ছিলাম না। এস এস কে এম হাসপাতালে এমারজেন্সির রোগীর আত্মীয়স্বজন এত বেশি রাত জাগতে আসছে—সিমেন্টের বেঞ্চগুলো দখল করে রাখছে—আমি শোবার জায়গাই পাচ্ছিলাম না। তাছাড়া হাসপাতালের বেয়ারারা তখন আর পয়সা না নিয়ে আমায় শুতে দিতে চাইছে না। অন্য যেসব জায়গায় শুতাম—সেখানে আরও অনেক ক্যাণ্ডিডেট বেড়ে গেছে। আমার আবার বাবু অভ্যেস হয়ে গেছে। একদম আকাশের নিচে শুতে পারি না। তা যদি পারতাম তো সারা কলকাতাই আমার শোবার জন্যে পড়ে ছিল।

তুষারদাকে কথা দিয়ে আমি দুপুর দুপুর গলফ্ ক্লাবের গায়ে মহুয়াদের বাড়ি চলে গেলাম। ঝোলা নিয়ে—যাতে আমার দাঁতন, সাবান, গামছা—আর তুষারদারই দেওয়া দালালির টাকায় কেনা

কয়েকটা প্যাণ্ট শার্ট। কাবলি জুতো পায়ে।

আমারই ঠিক করে দেওয়া বাড়ি। এর অন্ধি-সন্ধি আমার সবই জানা। গলফ্ ক্লাবের দেওয়ালের গা দিয়ে চলে যাওয়া নির্জন রাস্তার ওপর বাড়িটা—কেউ দেখেও দেখে না। সিমেন্টের মেঝে। চ্যাটাই বেড়ার দেওয়াল। ঢাকা বারান্দা। কিন্তু শ্যাওলা ধরা। ফাটা। মাথায় টালি। টিউবওয়েল বিকল বলে চৌবাচ্চায় ভারীর জল নিত্যদিন ধরে রাখতে হয়। কিন্তু পুরনো ভাড়াটের সঙ্গে কমন কল-বাথরুম—তাই তার সঙ্গে পরামর্শ করেই ভারীর জল নেওয়া—তার মর্জি বুঝেই সে জল খরচা করা। নয়ত সামান্য এদিক ওদিকে খিটির-মিটির লেগে যেতে পারে। এই পরামর্শ করে নেওয়ার পরামর্শটা তুষারদারই দেওয়া।

শিখা তুষারদার আদল পেয়েছে। ঢ্যাঙা। কিন্তু অ্যাটট্রাকটিভ। আমি বারান্দায় গিয়ে বসতেই শিখা আমার ঝুলির থেকে বের করা জিনিসপত্র দেখতে পেল। দেখে চেঁচিয়ে উঠল, এ ম্যাঁ! কি নোংরা! দেখে যাও মা—

মহুয়া এসে আমাকে দেখল। আমার জিনিসপত্র দেখল। আমি তখন সবে গায়ের জামাটা খুলে পাঁজর বেরনো বুক নিয়ে কলতলার দিকে তাকাচ্ছি। ইচ্ছে—চানটা সেরে ফেলি। চান করে উঠলেই তো এরা দুপুরের মিলটা দেবে। খিদেও পেয়েছে। খেয়ে নেব সঙ্গে সঙ্গে। আমাকে ভাল করে দেখল মহুয়া। ওপর থেকে। কারণ, আমি তো বারান্দায় বসে। আর মহুয়া সেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে। যাবার সময় চাপা গলায় বলে গেল মহুয়া—সঞ্জয়ের জামাকাপড়গুলো কেচে দাও।

আমার ময়লা পাজামা—কেলেকুষ্টি শার্ট দুটো আমি খামচে ধরলাম। বললাম, না। আমার জামাকাপড় আমি কাচি।

সে তো দেখেই বুঝতে পারছি। প্রথম এলে। আজ শিখা কেচে দিক।

না। ও পড়াশুনো করছে—ও কেন কাচবে?

আমার এ কথায় মা-মেয়েতে চোখাচুখি হল। মহুয়া যে বলল—দেখেই বুঝতে পারছি—এ কথাটার দুটো মানে হয়। এক ঃ আমি খুব খারাপ কাচি। দুই ঃ আমার চেহারাটা অনেকটা সেরকমই—যারা বাড়ির কাচাকাচি করে থাকে। মানে মাসমাইনের লোক আর কি।

ছোট্ট ঘরখানায় শিখা বসে বসে পড়ছে। খুব মন দিয়ে। যেন ওদের ওপর দিয়ে কোন ঝড় বয়ে যায়নি, যেন ওর মাকে ছেড়ে দিয়ে তুষার সরকার ফের বিয়ে করেনি।

কলতলায় উবু হয়ে বসে শার্ট দুটো জলকাচা করছি। টপাস করে একখানা সাবান এসে পড়ল হাতের কাছে। ঘষে নিয়ে ফেনা করে কাচো। নইলে ও ময়লা কি জলকাচায় কাটে?

যেমন বেগে মহুয়া এসেছিল তেমনি বেগে রান্নাঘরে ফিরে গেল। বোঝাই যায় রাঁধতে বসে আমায় দেখতে পেয়ে সাবান দিতে উঠে এসেছিল। হাঁটায় চলায় তেজ আছে। কেমন হাড় হাড় চেহারা। কোথাও এক্সট্রা মেয়েলি চর্বি নেই। সেই যে পিঠের দিকে—ব্লাউজ ঠেলে উঁচু হয়ে থাকে—তা নেই একদম! এমন বউ ছাড়ল কেন তুষারদা? এমন মেয়েছেলে কেউ বদলায়!

দুপুরে বেশ ভালই খেলাম। বহুকাল পরে! কোন বাড়ির রান্না অনেকদিন খাইনি। খেয়ে দুপুরেই ঘুমিয়ে পড়লাম। আমার তো কোন বিছানা নেই। যেখানে শুই—সেখানে ঝোলাটা গুটিয়ে মাথার বালিশ করে ফেলি। মাদুরও নেই আমার। শিখা আমার দিকে তাকাতে তাকাতে বারান্দায় একখানা মাদুর পেতে দিল, নাও শুয়ে পড়। ঘুমে ঢুলছ যে—

কোন কথা না বলে তাতে শুয়ে পড়লাম। শুতেই ঘুম। ঘুম ভেঙে গেল। আমার নাম করে অনেক দূর থেকে কে ডাকছে। সঞ্জয়! ও সঞ্জয়—

চোখ চেয়ে দেখি—মহুয়া। আমার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে। গলফ্ ক্লাবের আকাশ কাত হয়ে জল ঢালছে। সাদা বৃষ্টি পরদা

হয়ে সামনের সবকিছু ঢেকে দিল।

বৃষ্টির ছাঁট এসে গায়ে লাগছে। ভেতরে এসে ঘুমোও।

দুদ্দাড় করে উঠে গিয়ে সামনের বড় ঘরের মেঝেতে মাদুরখানা পেতে তার ওপর ঘুম চোখে ভূতের মত বসে আছি।

মহুয়া বলল, যেমন ঘুমোচ্ছিলে—ঘুমিয়ে পড়। এখানে বৃষ্টির ছাঁট আসবে না।

তবু বসে আছি।

শোও। শুয়ে পড়ো। অঘোরে ঘুমোচ্ছিলে।

তবু বসে আছি।

ওঃ! আমি কোথায় শোব? আমি দুপুরে ঘুমোই না। ওই শাড়িটায় ফেব্রিক করব। আঁকা হয়ে পড়ে আছে তিনদিন।

ফেব্রিক টেব্রিক আমি তখন কিছু জানি না। দেখলাম, তক্তপোশের ওপর একখানা থানে পেনসিলে কলাপাতা আঁকা।

শুয়ে পড়ো। শিখা পড়তে গেছে। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে।

আবার শুয়ে পড়লাম। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে এলোপাতাড়ি। ভেতরে বেশ আরাম। শুধু দু'একটা পোকা মাঠ থেকে উড়ে এসে লাফিয়ে পড়ছে। একবার ঘুমোলে এসবে আমার কিছু যায় আসে না। ঘরের ভেতরটা অন্ধকার। অনেকদিন কোন ফ্যামিলির ভেতর থাকিনি। এত আরাম পাইনি অনেকদিন। ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে দেখলাম—পাজামা, শার্ট কেচে যা বাইরে টাঙিয়ে দিয়েছিলাম—কখন মহুয়া সেগুলো ভেতরে এনে ঝুলিয়ে দিয়েছে—পাছে আবার বৃষ্টির ছাঁটে ভিজে ওঠে। বুঝতে পেরেছে—আমার পোশাক বলতে ওই ক'টাই। না শুকোলে কী গায়ে দিয়ে বেরব?

সন্ধ্যের মুখে আরও অন্ধকারে ঘুম ভাঙল। মাথার কাছে চায়ের কাপ হাতে মহুয়া। আর ঘুমিয়ো না। শরীর খারাপ হবে।

উঠে বসে চা খাই। জানতে চাই, আলো নেই?

না। লোডশেডিং। —বলতে বলতে বাঁ হাত দিয়ে মহুয়া

তার ডান হাতের ওপর একটা মশা মারল। অবছা অন্ধকারে সমর্থ মানুষের মতই ডান হাতখানি—তামাটে রঙের—ফুটে উঠেছে। তাতে থ্যাতলানো মশাটার লাল রক্ত আলোর অভাবে আমার চোখে কালচে লাগল! বুঝতে পারছি না—মহুয়াকে আপনি বলব, না, তুমি? ও তো গোড়া থেকেই দিব্যি আমাকে 'তুমি' 'তুমি' করে কথা বলে চলেছে। আজকাল মেয়েরা খুব ইজি হয়ে যায় সহজে। সেই জড়োসড়ো ভাব আর দেখা যায় না।

একটা ফ্যামিলির ভেতর তাদের করা চা ফের খাচ্ছি অনেকদিন পরে। বেশ লাগছে খেতে। কাপের শেষদিকে চিনি জিভে লাগল। ওঃ! চায়ের একটা গন্ধও যেন পেলাম।

এই সময় মহুয়া বলল, পুরুষছেলে—এভাবে শুয়ে থাকতে নেই। সন্ধ্যের মুখে যাওনা কোথাও হেঁটে এসো। তাতে শরীরটা ভাল থাকে।

আমি সঞ্জয় ঘোষাল। খাই দাই এখানে সেখানে। শোয়াও তাই। আমার খাওয়া শোওয়া এভাবে কতকাল পরে হল। সেই যোগেশচন্দ্রে পার্ট ওয়ানে গাড্ডা খাওয়ার পর দাদা যখন বলল—পথ দ্যাখো—তারপর আর কখনও এভাবে খাইনি। ঘুমোইনি। তার ওপর আবার আমার শরীর কিসে ভাল থাকবে—তাই নিয়ে কথা বলছে। ও হরি! এ আমার কী হল? আমার ভাগ্য ফিরে গেল! আমি কি লটারি পেলাম।

বললাম. হাঁটলে তো মেয়েছেলেদেরও শরীর ভাল থাকে।

মাদুরের বাইরেই—খানিক দূরে বসে ছিল মহুয়া। উঠে কাপ দুটো হাতে নিয়ে হেসে বলল, আমার শরীর? এমনিতেই ভাল থাকে। আমি তো দুপুরে ঘুমোই না। তোমাদের সবার থালা, এঁটো যা ছিল—সব বারান্দায় বসে বসেই বৃষ্টির ছাঁটে ধুয়ে নিলাম। তারপর ঘর গুছনো। যাও হেঁটে এসো। ফেরার পথে দুটো বেগুন আনবে। শিখাও ফিরবে এখন। ক'টা বেগুনি ভাজব।

রান্নাঘরে যাবার পথে ছোট্ট ঘরখানার দেওয়ালে বাজারের ব্যাগ ঝুলছে। হাতে নিয়ে বেরোচ্ছি। ঠিক ভদ্দরলোকদের মত। পায়ে জুতো। মাথা আঁচড়ানো। যেন একজন ফ্যামিলিম্যান।

পয়সা নিয়ে যাও।

বললাম, আছে আমার সঙ্গে।

রাস্তায় পড়ে প্রথমেই মন এল—মহুয়াকে দেখে কে বলবে—অল্প-দিন আগে তুষার ওকে ছেড়ে দিয়ে ফের বিয়ে করেছে।

রাতেও ফের বৃষ্টি। দুপুরের চেয়ে অনেক জোরে। আমার কোন অসুবিধে হচ্ছিল না। রাস্তার লাইটপোস্টে একটি রুগ্ন বাল্ব। সামান্য আলো দিয়ে সেই ডুমটাই যেন বিরাট এক প্রহেলিকা তৈরি করতে চলেছে। গলফ ক্লাবের সারা মাঠে ঘাসের নিচে যত ঝিঁঝিঁ ছিল—তারা এক মহাসংকীর্তন শুরু করে দিল।

বড় ঘরের দোরে এসে মহুয়া দাঁড়াল। ভেতরে এসো সঞ্জয়। ওভাবে কেউ শুতে পারে নাকি?

পাশের ছোট ঘর থেকে শিখা চেঁচিয়ে উঠল, তোমার আদিখ্যেতা রাখোতো মা। আমি কিন্তু এখন উঠতে পারব না।

হ্যাঁ, তুমি উঠবে। আমার কাছে এসে শোবে। সঞ্জয় তোমার ঘরে শোবে।

আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। আমি এখন উঠতে পারব না মা।

বললাম, থাক না। সবাইকে বিরক্ত করে লাভ! আমি দিব্যি ঘুমিয়ে পড়ব'খন।

সে তো দুপুর থেকেই দেখছি। উঠে এসো! বর্ষার নতুন জলে ভিজলে আর রক্ষা নেই। নির্ঘাৎ জ্বর হবে। উঠে এসো।

রাগে রাগে কাঁথা হাতে আমার সামনে দিয়ে শিখা পাস করল। আমি গিয়ে শিখার খাটে শুলাম। খুব সাবধানে। পাছে ওর বিছানা ময়লা হয়ে যায়। শিখা গিয়ে বেশ শব্দ করে মহুয়ার খাটে পড়ল যেন ঘুম জিনিসটা একটা আছাড়।

শুয়ে শুয়ে মনে হল সারা পৃথিবী এখন বৃষ্টির পায়ের নিচে।

আমরা সবাই কেমন আছি—তাই দেখতে এলেন তুষারদা। খুব ভোরে। তখন কোন বৃষ্টি নেই। আকাশ এখন নিপাট ভাল লোক।

বাবাকে দেখে শিখা নেচে উঠল। তুষারদা দুধের পাত্রটা নামিয়ে দিয়ে বললেন, এক কাপ চা দিবি?

মা দেবে—

উঠেছে?

কখন! তোমার জগিং হয়ে গেল?

অয়্যারলেস পার্ক থেকে তো ছুটতে ছুটতে এলাম। ঠিক ষোল মিনিট লাগল। সঞ্জয় কোথায়?

এই তো আমি—বলে বিছানা থেকে উঠি। এখানে মহুয়াদের পাহারায় থেকে তুষারদাকে আমি একটা ফেভার করছি ঠিকই। এখন আমার একটু ডাঁটে থাকা দরকার। কিন্তু দৌড়ে প্রায় ভোররাতে চলে আসা এই মানুষটাকে এখানে চেয়ারে বসা একটি চিতা বলেই মনে হচ্ছে আমার। সুস্থ. সাহসী—সবার খোঁজ নেয়। চালাকও বটে। পেছন থেকে কেউ অ্যাটাক করলে তুষারদা সঙ্গে সঙ্গে পেছনে পা চালিয়ে লাথিও কষাতে পারেন। তাঁর সামনে আমি বিছানা থেকে উঠে এলাম—বয়সে বছর দশেকের ছোট—শরীরটা ভাঙাচোরা—একগাল দাড়ি—চোখে চশমা দিলে তবে স্বাভাবিক হই।

ঘুম হল?

ফাস্ট ক্লাস।

কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো?

একদম না। —বলে শিখার মুখ চোখে পড়ল। শিখা সারা মুখে বিরক্তি ফুটিয়ে মুখখানি আমার দিক থেকে ঘুরিয়ে নিল।

মহুয়া এসে আমাদের চা দিল। সে এখন তুষারদার বউ নয়। তুষারদা বেড়াতে এসেছেন। তাকে চা দিল মহুয়া। আমাকেও দিয়েছে। কিন্তু এ বাড়ির ভাড়াটা তুষারদা দেন। দেন ইলেকট্রিক বিল। আরও কী দেন তা আমি জানি না। এ এক অদ্ভুত অবস্থা। ওরই ভেতর মহুয়া বলল, চিনি ঠিক আছে?

আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তুষারদা বললেন, হ্যাঁ। ঠিক আছে।

তুষারদা তখন জানতে চাইছিলেন, কারা ঢিল ছুঁড়েছিল—ছুঁড়তে পারে—তার একটা আন্দাজ করতে হবে তোমাকে। দরকারে বিকেলে গলফ্ ক্লাবের মাঠে গিয়ে পাড়ার ছেলেদের ফুটবল খেলা দেখবে—খেলাধুলো দেখবে—একদম এলেবেলে দাঁড়িয়ে থাকবে। ওয়াচ করবে। কে কে এ-বাড়ির দিকে তাকায়। শিখা বড় হচ্ছে। সব কিছু লক্ষ্য করে আমায় একটা রিপোর্ট দেবে সঞ্জয়। ক'দিন পরে আমি আবার আসব। তারপর আমি অল-আউট অ্যাকশন নেব। দরকারে এদের আড্ডার মোড়গুলো—চায়ের দোকান চিনে নেবে। ফলো করবে—

ভাবি, আমি কি তোমার বাবার চাকর? আমি ফলো করব!

আমি ওয়াচ করব!! আমি রিপোর্ট দেব!!!! আমি কি পুলিসের খোচড়ের মত তোমার খোচড়, তুষারদা? মহুয়াকে যদি ছেড়ে না যেতে হত এমন সিচুয়েশনই হত না।

যাবার সময় তুষারদা বললেন, আমাকে একটু এগিয়ে দেবে চলো!

সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছি—এমন সময় বারান্দায় এসে শিখা বলল, আবার কবে আসছ বাবা?

এই চলে আসব আবার। দেখি—

ব্যস রাস্তার কাছাকাছি গিয়ে তুষারদা আমার হাতে দু'খানি একশ টাকার নোট দিলেন।

কিসের টাকা?

কাছে রাখো। কখন কী কাজে লেগে যায় বলা যায় না।

এখানে আবার আমার কী কাজ! খাব দাব ঘুমোব। একটু আধটু ফেরে ঘরে আসব।

তোমার বাড়ি খুঁজে দেওয়ার কাজটা ছেড়ো না।

সে জন্যে তো আজ থেকে আবার বেরুব। আপনার দেওয়া দালালির টাকা তো ফুরিয়ে এসেছে।

এর ভেতর? অতগুলো টাকা কিসে ফুরোল সঞ্জয়?

মার্কেটে ধারধোর হয়ে গিয়েছিল। সে-সব একদম শোধ করে দিলাম।

ভাল। খুব ভাল। ধার রাখতে নেই।

আমায় একটা চাকরি করে দিন না। বাড়ির দালালিতে এখন স্টিফ কমপিটিশন।

তোমরা তো এখন সিণ্ডিকেট করে দল পাকিয়ে বাড়ি খুঁজে দিচ্ছ। তাতে কোন ক্লায়েণ্ট ফসকে যাচ্ছে না যেমন—

কিন্তু দালালিও যে ভাগ হয়ে যাচ্ছে তুষারদা।

কী করবে? সবাইকেই তো বাঁচতে হবে। সবাই একসঙ্গে থাকলেই, মিলমিশ করে থাকলেই উটকো ঝামেলা আমাদের কিছু করতে পারে না সঞ্জয়। সবাই একসঙ্গে থাকা যায় না?

তা বটে। তবু যদি একটা চাকরি পেতাম।

দেখি। কোন কথা দিচ্ছি না কিন্তু।

আট

আদিগঙ্গার গায়ে সমর স্যারের টিউটোরিয়াল ঠিক তপোবন নয়। তবে দেশভাগের সময় নেওয়া জবরদখল জায়গায় সমর স্যারের বউ অনেক গাছ লাগিয়েছিলেন। তিনি আর নেই। গাছগুলো আছে। তারা বড় হয়েছে। ছায়া দেয়। আম হয়—কাঁঠাল হয়—নারকেল সুপুরি তো হয়ই। সমর স্যারের তিন মেয়ে পার করতে ভাল গেছে। তাই পাকা ছাদ দিতে না পারলেও—ঢেউ টিনের নিচে বড় বড় বারান্দা—তাতে ফুলের টব…মুলী বাঁশের চিক। পাশেই বর্ডার দিয়ে আদিগঙ্গা। বর্ষায় বেশ ঘোলা ঘোলা নদীর জল যেন। আবার অনেক সময় মরা গরু মোষ ফুলে ঢোল হয়ে ভাসতে ভাসতে

আসে। তখন সমর স্যার নিজেই লগা দিয়ে ঠেলে ঠেলে সরিয়ে দেন। নয়ত গন্ধে তিষ্ঠোনো যায় না।

আজ সেসব কোন গন্ধ নেই। আজ দুপুরবেলায় শ্রাবণ মাসের জ্বালা ধরানো রোদের তাত এখানে বোঝাই যাচ্ছে না। গাছের দল যে যতটা পারে ছায়া দিয়েছে। মাঝে মাঝে বৃষ্টির গুঁড়ো মাখানো ঠাণ্ডা বাতাস। তার ভেতর সমর স্যারের টিউটোরিয়ালে পরীক্ষা নেওয়া চলছে। তিনিই কোশ্চেন করে জেরক্স করে দেন। তিনিই খাতা দেখেন। আবার পরীক্ষার সময় তিনিই গার্ড দেন। এমনকি পরীক্ষার পর খাবারের প্যাকেট দেন। এতে নাকি স্টুডেণ্টদের মনে একটা সিরিয়াসনেস আসে। এজন্যে তিনি বারো টাকা করে একজামিনেশন ফি নেন। এখন পরীক্ষা দিচ্ছে মোট ষোল জন।

আজ ছিল ইংলিশ। পরীক্ষার পর শিখা প্যাকেট খুলে রাধাবল্লভী, পান্তুয়া, আলুর দম খেয়ে টিউবওয়েল টিপে জল খাচ্ছিল। হাত ধুচ্ছিল।

এমন সময় পল্টু এসে বলল, আমায় একটু কলটা টিপে দেবে ? একই সঙ্গে টেপা....জলখাওয়া আমার হয় না।

শিখা ভেবেছিল, দেবে না। কিন্তু জল খাওয়া-তো। জেনেশুনে কেউ না বলতে পারে না। হ্যাণ্ডেল টিপে দিতে দিতে শিখা বলল, শুধু শুধু পরীক্ষা দিতে এলি কেন পল্টু ? তুই তো কিছুই লিখতে পারিসনি। লিখতে লিখতে তোর খাতা আড়চোখে দেখলাম....

পল্টু না। আমি অশোক। তুমি আমায় 'তুমি' বলতে পার না শিখা !

ওই হল। তুমি তো পাতায় পাতায় শুধু দাগ টানছিলে। পরীক্ষায় বসা কেন ?

আমি তো পরীক্ষা দিতে আসিনি।

তাহলে ?

তোমায় দেখতে এসেছি। অনেকক্ষণ ধরে তোমায় দেখতে পাব

পরীক্ষা দিতে দিতে···তাই।

মারব এক চড়। সারাদিন শুধু এইসব ভাবিস···তাই না ? ভালবাসা ভালবাসা করেই গেলি। অথচ ভালবাসার কোন কিছুই জানিস না।

বাকিরা পরীক্ষা দিচ্ছে। একজন বেরিয়ে এসে কাঁঠাল গাছের ছায়ায় দাঁড়াল। এবার প্যাকেট খুলে টিফিন খাবে। কেমন একটা পরীক্ষা পরীক্ষা ভাব সারা গাছতলায়।

তোমার সঙ্গে প্রায়ই দেখা হবে বলেই তো আমি সমর স্যারের টিউটোরিয়ালে ভর্তি হলাম। নিতে চান না কিছুতেই। শেষে দু'মাসের চার্জ লেট ফি নিয়ে আমায় ভর্তি করলেন।

স্যার যা পড়ান···কিছু বুঝতে পারিস ?

একদম না। আমি তো এসব কিছুই জানি না। পড়িয়ে যান স্যার···আমি তাকিয়ে থাকি···কিছু বুঝি না।

তাহলে ?

স্যার বলেছেন···এক্সট্রা কোচিং দিয়ে তৈরি করে দেবেন। আমি হায়ার সেকেণ্ডারিতে অন্তত লাস্ট হতে পারব। সেই আশা রাখি।

আর কবে ! কবে দেবেন কোচিং ?···বলতে বলতে শিখা হাসি চাপল।

ফাইনালের ঠিক আগে, শিখা।

তোকে তোদের বাড়িতে মারে না ?

মারে। খুব মারে।

কে কে মারে ?

বড়দা, বাবা সবাই।

শুধু মারে ?

হ্যাঁ শিখা। আমি যে অনেকদিন ধরে হায়ার সেকেণ্ডারি ফেল করে আসছি।

কুলকুল করে বেরিয়ে আসা হাসি কখন যে ভেতরে ভেতরে শুকিয়ে গেল—তা টের পেল না শিখা। সে জানতে চাইল, ফেল করিস কেন ?

তোমার কথা সব সময় ভাবি।

আমার কথা ?

হ্যাঁ। তোমরা তো কুদঘাট ব্রিজের কাছ থেকে উঠে গেলে। তার অনেক আগে থেকেই তোমার কথা ভাবি।

কতদিন ? ঠিক মনে করে বলতে পারিস ?

পারি। তুমি তখনও স্কুল ফাইনাল দাওনি, শিখা।

তখন থেকে ? আমি তো তখন ছোট ছিলাম।

তাতে কী ? তখন থেকেই তোমাকে আমার সুন্দর লাগে।

সারাদিন যদি আমার কথা ভাবিস—

আবার তুই করছ ?

ওঃ। সরি। ভুল হয়ে গেছে পল্টু—

পল্টু নয়। অশোক।

ওই হল। সারাদিন আমার কথা ভাবলে তো পাস করা হবে না।

এ কথার কোন জবাব দিতে পারল না পল্টু। খুব অসহায়ভাবে শিখার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

ততক্ষণে আরও তিনজন পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। শিখা বলল, আয় বড় রাস্তায় গিয়ে মিনি ধরব।

এখুনি চলে যাবে শিখা ? জীবনে এই প্রথম তুমি আমার সঙ্গে ভালভাবে কথা বললে—

ওরকম বোকার মত কথা বলছিস কেন ? এমন লম্বা চওড়া—তাগড়া ছেলে তুই। আমাকে দেখলেই অমন মিইয়ে যাস কেন ? আয়—

আমি ভিতু নই। একখানা ছোরা দাও। দু'পাশে ধার হওয়া চাই। এমন সুন্দর ছুরি চালাব না—সাতজনের সঙ্গে একা লড়ে যাব। একাই মোকাবিলা করব। দেখে নিও—

হাঁটতে হাঁটতে কথা হচ্ছিল দু'জনে। দু'ধারে বাড়ি। তার ভেতর দিয়ে সরু রাস্তা চলে গেছে বাসরাস্তায়। ওখানে দাঁড়ালেই মিনি, ২০৮, এস টু, অটো সব পাওয়া যায়।

শিখা স্টপে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, হয় ভালবাসা—না হয় দু'পাশে ধার দেওয়া ছোরা? এ ছাড়া আর কিছু বুঝিস না?

পল্টু কী বলার চেষ্টা করল। বলতে পারল না। মিনিবাস এসে দাঁড়াতেই শিখা উঠে পড়ল। অশোক বা পল্টু খানিকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর একা হেঁটে কাঠের পোল পেরিয়ে ডান হাতের রাস্তা ধরল। এদিকটায় যতদূর তাকানো যায়—শুধু বাড়ির পর বাড়ি। সবই নতুন। সবসময় বাড়ি তৈরি হচ্ছে।

পল্টু শিখার কথাটা ফুটবলের মত একবার মাথা দিয়ে হেড করল। অবশ্য মনে মনে। আর একবার বুক দিয়ে ফুটবলের মতই পায়ের দিকে গড়িয়ে দিল। শেষে পা দিয়ে যেন শূন্যে কিক করল। তার সারা শরীর জুড়ে এখন শিখার কথাটা জড়িয়ে জড়িয়ে উঠছে।

হয় ভালবাসা—না-হয় দুপাশে ধার দেওয়া ছোরা? এছাড়া আর কিছু বুঝিস না? আর কিছু ভাবিস না? আর কিছু মাথায় আসে না? এরকমই যেন কী বলেছিল শিখা।

শোনো শিখা। আমি তো আর কিছু জানি না। আমার আশা সমর স্যার পরীক্ষার ঠিক আগে আগে এক্সট্রা কোচিং দিলে আমি হয়ত হায়ার সেকেন্ডারিতে লাস্ট হতে পারব। সেটাও তো কম কথা নয়। সেটাও তো একটা কিছু হওয়া।

আমার মনের ভেতরের এত কথা তোমায় একসঙ্গে সময়মত বলতে পারি না শিখা। আমি আমার সারা শরীরের জোর দিয়েও তোমার কাছে যেতে পারি না। কেন যে পারি না—তা জানি না। তখন মনে হয়—ফুটবলের মাঠে আমার পায়ের এই কিক—আমার ঘুসি—এসব দিয়ে কী হবে?

প্যাকেজিং সেকশনে সঞ্জয় দশ দশটা সিগারেটের প্যাকেটের বাইরের সেলোফেন মোড়া ঠিক মত হল কিনা তাই চেক করছিল। ফাইন আঠা দিয়ে সেলোফেনের মোড়ক আটকানো হয়। তারপর সরু একফালি চকচকে সেলোফেন দিয়ে ফাইনাল বাঁধন দেওয়া হয় প্যাকেটে।

অনেকদিন বন্ধ থাকার পর আবার সঞ্জয়দের কোম্পানি তাদের পপুলার দুই ব্র্যান্ডের সিগারেট বাজারে ছাড়তে শুরু করেছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে হোর্ডিং লাগানো চলছে। কাগজে রঙিন বিজ্ঞাপন। এই দুটো ব্র্যান্ডের একসময় খুব নাম ছিল। ফিরে বাজার নিতে পারলে কোম্পানি আবার দাঁড়িয়ে যাবে।

একজন বেয়ারা এসে বলল, আপনাকে একবার ইউনিয়ন অফিসে যেতে বলেছেন।

কে ?

অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি—অসিতবাবু—

ওহ্ ! যাচ্ছি এখুনি।

আপনার কাজ হয়ে গেলে যেতে বলেছেন একবার।

নাঃ। ডেকেছেন যখন দেখা করে আসি।

যেতেই অসিতবাবু বললেন, কোন তাড়া ছিল না। এসেছ যখন ভালই হল সঞ্জয়। তুষারের খবর কী বলো তো ? তার পরিচয়েই তোমার সঙ্গে আমার পরিচয়। ও ধরেছিল বলেই তোমার এখানে চাকরি। কী হয়েছে তুষারের ?

আপনারা পুরনো বন্ধু। আপনি জানেন না ?

ভাসা ভাসা কানে এসেছে। যা শুনেছি, তা হলে সত্যি ?

হ্যাঁ।

তুষার আবার বিয়ে করেছে তা হলে ?

হ্যাঁ।

চুপ করে থাকলেন অসিতবাবু। তারপর বললেন, আমাদের স্টুডেন্ট লাইফে ভাল স্পোর্টসম্যান ছিল তুষার।

এখনও রেগুলার জগিং করেন ভোরে। ফিট বডি।

অসিতবাবু কোন কথা বললেন না। খানিক দাঁড়িয়ে থেকে সঞ্জয় নিজের ডিপার্টমেন্টে ফিরে আসছিল। পুরনো কায়দার ঢাউস বাড়ি। কাঠের সিঁড়ি। হল ঘর। ঝাড়লণ্ঠন। বাড়িটা নাকি একসময় এক আর্মানি মার্চেন্টের ছিল। অন্তত শ'খানেক বছর আগে।

প্যাকেজিং ডিপার্টমেন্টে ফিরে আসার আগে কোম্পানির ঘরের দিকে সঞ্জয় তাকাল। অন্তত তিরিশ বিঘার বিশাল লন। তাতে নানান জাতের শৌখিন গাছ। ফিরে চালু হতে সেইসব গাছপালা সাফ সুতরো করে বাগানটা সাজানো হচ্ছে। আগাছা কেটে ফেলে নতুন গাছও লাগানো চলছে।

একটা সরু মত সিঁড়ি দিয়ে একদম মাঠে নেমে এল সঞ্জয়। জায়গাটা গলফ ক্লাবের মাঠের মতই নির্জন।

এরকম নির্জনে একদিন ঘরের ভেতর জানালার কাছে টুলে বসে মহুয়া ফেব্রিকের কাজ করছে মন দিয়ে। একসঙ্গে অনেক অর্ডার এসেছে। ভীষণ কাজের চাপ। মহুয়ার গালে এসে রোদ পড়েছে। শিখা বাড়ি নেই।

সঞ্জয় আর পারল না একদম কাছে গিয়ে সঞ্জয় মুখ নামিয়ে মহুয়ার গালের ওপর একটা চুমু রাখল আলতো করে।

মহুয়া খুব আস্তে মুখ তুলল। সিধে সঞ্জয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, এটা কী হল ?

সঞ্জয় মুখ কাচুমাচু করে বলল, আমি আর পারছিলাম না মহুয়া।

সে আমি অনেকদিনই বুঝতে পেরেছি।

কী করে বুঝল মহুয়া—তা জানতে চাইতে পারল না সঞ্জয়। মহুয়াই বলল, আমায় আপনি বা তুমি কিছুই ডাক না। আবার নাম ডাক ধরেও ডাক না। এমনকি বৌদিও বল না।

তাতে কী বুঝলে? এই তো তোমায় তুমি বললাম।

এই প্রথম বললে। যখন তোমরা আমাদের কিছু বলেই ডাক না তখনই—আমরা মেয়েরা তোমাদের ঠিক বুঝতে পারি।

তাই?

হ্যাঁ। আমি অপেক্ষা করে দেখছিলাম—তোমার কতদিন লাগে!

কী লাগে?

এই—তোমার ধরা দিতে। আজ তুমি আর নিজেকে ঢেকে রাখতে পারলে না। এসো। এদিকটায় এসো—বলে মহুয়া ঘরের কোণে গিয়ে দাঁড়াল। সঞ্জয় কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই মহুয়া তাকে জড়িয়ে ধরল। এবার আরও জোরে সঞ্জয় মহুয়াকে বুকে নিল। সঞ্জয় দেখল, মহুয়া চুমু খেল শান্তভাবে, কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে। মুখ তুলে। এরপর এমনই হতে থাকল—শিখা বাড়ি না থাকলেই, অল্পক্ষণের ভেতর সঞ্জয়-মহুয়া—দুজনই ভীষণ এলোমেলো হয়ে যায়।

সে এমনই একটা সময়, সেকথা মনে হতেই, অফিস বাড়ির লনের সামনে দাঁড়িয়ে সঞ্জয়ের শরীরের ভেতরটা চিন চিন করে উঠল। কী একটা মাঞ্জা দেওয়া সরু কিন্তু শক্ত সুতো তার শিরার ভেতর দিয়ে কে যেন আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সেই সুতোর ঘষায় তার ভেতরে কেটে যাচেহ। আবার একটা চিলিকও দিচেহ। নার্ভ-গুলো যেন চিড়িক দিয়ে উঠল।

একদিন দুপুরে শিখা বাইরে থেকে ফিরে জুতো খুলতে খুলতে ঘরের চারিদিকে তাকাল। মা? তুমি কোথায়? রান্নাঘর থেকে মহুয়া জবাব দিল এই তো আমি। কেন? বলো?

এক্ষুনি এখানে এসো। মহুয়া ছুটে এল। কী?

তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে মা?

কেন? বাড়িতে—রান্নাঘরে।

আমার কেমন যেন লাগছে। সেই বাড়ির-দালালটা কোথায়?

সঞ্জয় বারান্দার কোণে বসে ভাঙা দাএর হাতল লাগাচ্ছিল ঠুকে ঠুকে। তার কানেও শিখার গলা পৌঁছল। সে ঠোকা বন্ধ করল।

ওভাবে কথা বোলো না শিখা। সঞ্জয় একজন ভাল লোক।

সঞ্জয় একথাও শুনতে পেল। মহুয়া জানে, আমি বারান্দার যে দিকটা কলতলার দিকে ঘুরে গেছে—রাস্তা থেকে দেখা যায় না, সেখানে বসে আছি। সকাল থেকে দা, বঁটি, স্টোভ—এইসব সারাচ্ছি।

ভাল না ছাই।

তাকে আমার ভাল লাগতে পারে।

শিখা চেঁচিয়ে উঠল, মা—

হ্যাঁ শিখা। তুমি বড় হয়েছ। তুমি সবই বোঝ এখন।

কী বলছ মা ? বলতে বলতে শিখা হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল। সে-কান্না সঞ্জয় বারান্দায় বসে পরিষ্কার শুনতে পেল। কান্নার ভেতর শিখার গলা জড়িয়ে যাচ্ছে। মা—তুমি তো এমন ছিলে না। কী হয়ে গ্যাছ আজকাল।

এরপর আর কোন কথা নেই। কী মনে হল সঞ্জয়ের, সে খুব সাবধানে মাথা উঁচু করে খোলা জানালা দিয়ে ঘরের ভেতর তাকাল। স্পষ্ট দেখা যায় না। আলোর পাশাপাশি তাকানোর দরুন ঘরের ভেতরটা ঘষা কাচের মতই আবছা।

মহুয়া মেয়েকে বুকের কাছে টেনে নিয়েছে। দেখেই সঞ্জয় টুপ করে জানলার নিচে বসে পড়ল। পড়ে, মনে মনে বলল—শিখা লক্ষ্মীটি। আমি খারাপ লোক নই। আমাকে মেনে নিতে পার না ? আমরা সবাই একসঙ্গে বাস করতে পারি না ? আমি মহুয়াকে ভালবাসি। তোমার মাকে আমি কোনদিন ছেড়ে যাব না। দেখো—তোমার মাকে আমি খুব যত্ন করে রাখব। তুষারদা যেমন তোমার বাবা—আমিও তোমার একজন বাবা।

শিখা এবার কান্নার ভেতর দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে জড়িয়ে যাওয়া গলায় বলল, আমি সেদিনই বুঝেছি মা—

কী বুঝেছিস ?

সেদিন রাতে তুমি আমায় তোমার সঙ্গে শুতে ডাকলে—আর ওই লোকটাকে আমার ঘরে শুতে পাঠালে।

ওই লোকটা ওই লোকটা বলছ কেন? তার তো একটা নাম আছে।

আমি যে সে লোককে কাকু ডাকতে পারব না। সঞ্জয় কাকু আমার মুখে আসে না মা।

আর আনতে হবে না মুখে।

কেন মা ?

সঞ্জয় আমায় বিয়ে করছে।

মা—?

হ্যাঁ শিখা। তুমি এবার উঁচু ক্লাসে উঠছ। তুমি সব বুঝতে শিখছ। বড় হচ্ছ।

মা, বাবা যে আমাদের সব খরচ দিচ্ছে।

দেবে। যতদিন না সঞ্জয় নিজের পায়ে দাঁড়ায়। আমাকেও ফ্রেব্রিকের কাজ বাড়াতে হবে শিখা।

মা !—বলে আর কথা বলতে পারল না শিখা। বারান্দায় চুপচাপ বসা সঞ্জয়ের বুকের ভেতরটা এখানে ঢিপ ঢাপ করে উঠল।

মা আমরা কি আবার আগের মত থাকতে পারি না? তুমি, আমি, বাবা? সবাই একসঙ্গে ?

কী বলছিস পাগলের মত! তোর বাবা তো বিয়ে করেছে। আমারা কেন এখানে চলে এসেছি—তা তুই জানিস তো। তবে? একটু থামল মহুয়া। তারপর বলল, আর, কাকে তুই বাবা বাবা করছিস ? সঞ্জয়কে তুই তোর বাবা ভাবতে পারিস না শিখা ?

নাঃ। আমার বাবা তুষার সরকার। সে আমাদের বাড়িভাড়া— সব—সব কিছু দেয়। কোথায় আমার বাবা—আর কোথায় তোমার সঞ্জয়। বাবার মত একটা হেলদি হ্যাবিট আছে লোকটার ?

সঞ্জয়ও একদিন দেবে। দেখিস। ও নিজের পায়ে দাঁড়াক একবার।

এবার শিখা কোন কথা বলল না। খানিকক্ষণ চুপচাপ। সঞ্জয়ের বুকের ভেতর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল।

ঠিক তখন মহুয়া বলল, ও কিন্তু তোর কথা খুব ভাবে। তোর পড়াশুনো, তোর কিসে ভাল হবে।

ওসব কথা বাদ দাও মা।

তুই কি সঞ্জয়কে একটু সম্মান দিতে পারিস না শিখা!

সঞ্জয় ঘোষাল নিজের পেছন দিকটার ভেতর মনে মনে ঘোরাঘুরি করতে করতে এই পুরনো সিগারেট কোম্পানির আগাছা ঢাকা লনের একদম ভেতরে চলে এল। এখন আগরপাড়ার আকাশ পরিষ্কার। পুরনো পাতাবাহারের মরা গাছের ভেতর সিট্রেনেলা ঘাসের লম্বা-লম্বা ডাঁটির আড়াল সরে যেতেই সঞ্জয় দেখল, ওখানে একটা ভাঙা ফোয়ারাও রয়েছে। পাথর আর সিমেণ্ট জমিয়ে বানানো। তিন-চারজন লোক লম্বা বালতি দা আর কোদাল হাতে সব সাফ সুতরো করতে ব্যস্ত।

খানিক এগিয়ে ভাঙা ফোয়ারাটার গায়ে কী যেন লেখা চোখে পড়ল সঞ্জয়ের। ফোয়ারার যে-জায়গাটায় জল এসে পড়ত—সেখানে সাদা পাথরের ওপর কালো হরফের দাগ। প্রায় মুছে এসেছে।

সঞ্জয় ঘোষাল ভাল করে দেখার জন্যে উবু হয়ে বসল ফোয়ারার নিচে। হাত দিয়ে ঘষতেই পরিষ্কার হয়ে এল। ইংরেজিতে লেখা। অক্ষর মুছে এসেছে।

হেরজগ-প্রিষ্টিন।

১৮৯৯

হেরজগ কি সেই আর্মানি মার্চেণ্টের নাম ছিল? তা হলে প্রিস্টিন কে? তার বউ? আঠার'শ নিরানব্বই সালে ওদের কী হয়েছিল? বিয়ে নিশ্চয়ই।

তখন নিশ্চয়ই হেরজগ এই ফোয়ারা বানায়। এই লনে প্রিস্টিনকে নিয়ে বেড়াত হেরজগ। প্রায় একশ বছর আগে। ইউনিয়নের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট জেনারেল সেক্রেটারি অসিতবাবুর স্কুলফ্রেণ্ড তুষারদা। তুষারদার খবর রাখেন অসিতবাবু। তাঁকে আমি বলতে পেরেছি—তুষারদার খবরটা। কিন্তু মহুয়ার খবরটা বলতে পারিনি। বলতে পারিনি—মহুয়া সরকার এখন মহুয়া ঘোষাল। তুষারদার বউ এখন আমার বউ।

দশ

খুব ভোরে ঘুম ভেঙে যাওয়ায় সঞ্জয় বারান্দায় বসে আছে। পুজোর পরে এবার শীত বড় তাড়াতাড়ি চলে এল। এখনও কালীপুজোর চারদিন বাকি। গলফ্ ক্লাবের মাঠের পাশে ছোট ডোবার জল এখন শান্ত। সেখানে একটা বড় শোল মাছ রোজ ঘাই মারে। জলে ভুড়ভুড়ি ওঠে। মাঠের ভেতর দিয়ে শর্টকাট করার সময় সঞ্জয় দেখেছে। একবার ভাবল, মা-মেয়েকে তুলি। খুব ঘুমোচ্ছে। কিন্তু তুলল না।

ঠিক এই সময় তুষার সরকার জগ করতে করতে রাস্তার মাথায় ভেসে উঠল। একদিকে গলফ্ ক্লাবের মাঠের ভাঙা পাঁচিল। ভাঙা ফাঁক দিয়ে সওয়াশ-দেড়শ বছর আগের বনেদি ক্লাব হাউস—কাঠের দোতলা, সুইমিং পুল, রেস্তোরাঁর আভাস পাওয়া যায়। আরেকদিকে ভোরবেলায় সব একতলা, দোতলা দেখা যায়। ঘরে ঘরে মানুষজন ঘুমোচ্ছে। মধ্য, নিম্ন, উচ্চ—নানা মাত্রার বাঙালির বাড়ি। তুষারদা ছোটখাট চিতার ভঙ্গিতে ছুটে এসে পেঁছাল বলে। বেল্ট আটকানো সরু কোমরের ওপর চ্যাটানো বুক। পায়ে দৌড়নোর জুতোর তোল্লাই এক এক লাফে এগিয়ে আসছে। গায়ে স্লেট রঙের স্পোর্টস গেঞ্জি। মাথাট ক্রুকাট। যেন কোন স্পোর্টসে তাকে ফার্স্ট হতেই হবে।—এমনিভাবেই ছুটে আসা। কাঁধে একটা হ্যান্ডব্যাগ যেন লাফিয়ে উঠল। বাঁ হাতে একটি প্যাকেট।

শান্ত ভোরে ক্লাবের গলফ্ খেলার জায়গাগুলো সুন্দর করে সাজানো আর ছেঁটে দেওয়া ঘাসে ঢাকা। সেসব জায়গায় জমি ঢেউ তুলে ডাঙা একদম। আবার খানিকটা গড়িয়ে গিয়ে নাবি।

একী? তোমরা এখনও রেডি হওনি?

আমি তো কোন্ ভোরে উঠেছি। মহুয়া ঘুমোচেছ।

কী ?—বলে একমুখ হাসল তুষার সরকার। কাল রাতে খুব গল্পগাছা—আনন্দ হয়েছে বুঝি ?

না না তুষারদা। মা-মেয়েতে সন্ধে রাতে ঘুমিয়ে পড়েছে একই সঙ্গে। একই খাটে।

ডাকো ওদের। এই প্যাকেটটা রাখো।

প্যাকেটটা হাতে নিয়ে সঞ্জয় জানতে চাইল, কী আছে প্যাকেটে ?

ফুলের মালা একজোড়া। অর্ডার দিয়ে রেখেছিলাম। দোকান খোলার অনেক আগেই ওদের বাড়ি থেকে নিয়ে এলাম।

তুষারকে কী সে বসতে দেবে, বুঝতে পারছে না সঞ্জয়। একবার বড় ঘরের ভেতর উঁকি দিল। মহুয়া আর শিখা মুখোমুখি ঘুমোচ্ছে। এখন তুষারদাকে বলা যাবে না—যেন ওরা দু'জন কাল সন্ধেরাত থেকে একই খাটে শুয়ে আছে।

এই ভোরবেলা সঞ্জয় ঘোষাল এক পলকে কালকের বিকেলটা দেখতে পেল। শিখা বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছে—মা, এ হয় না। এ হয় না।

মহুয়া ফুলঝাড়ু দিয়ে ঘর সাফ করতে করতে বলছে, হ্যাঁ। হয় শিখা। তুমি আমার মেয়ে। তুমি আমার চেয়ে বড় নও। আমি কিছু কম বুঝি না।

তুমি শেষ পর্যন্ত ওই লোকটাকে বিয়ে করতে পারবে ?

ওই লোকটা. ওই লোকটা আমার সামনে আর কখনও বলবে না। সঞ্জয় কিছু খারাপ লোক নয়। কাল আমাদের বিয়ে। তুষার অনেক ভেবেচিন্তেই এসব ঠিক করেছে। তুষার আমার, সঞ্জয়ের ভাল চায়।

মর্নিং শিফটে ডিউটি দিয়ে বেলা তিনটে নাগাদ সঞ্জয় আগরপাড়া থেকে ফিরেছে। ফিরেই কলকাতায়। আগামীকাল তার বিয়ে। আজ অফিস থেকে তিনদিনের ছুটি নিয়েছে। এখন সে তার প্যান্ট শার্ট যতটা পারে ভাল করে কেচে শুকোতে দেবে। ঠিক এই সময় ঘরের ভেতর থেকে শিখার গলা তার কানে গেল। এ

হয় না। এ হয় না, মা।

কাপড়কাচা থামিয়ে সাবান ঘষতে ঘষতে শিখার গলায় একথাও সঞ্জয় শুনতে পেল ঃ বাবা আমাদের এত ভাল না চাইলেও পারত।

কাল বিকালে এ-বাড়িতে চা হয়নি। সঞ্জয় কাচাকুচি করে বারান্দার দড়িতে ভেজা প্যান্ট শার্ট টাঙিয়ে দিয়ে অশোকনগর বাজারের উলটোদিকে চুল কাটতে গেল।

ফিরতে ফিরতে প্রায় সন্ধে। চুল কাটতে গিয়ে মাথাটা ভাল করে শ্যাম্পু করেছে সঞ্জয়। ক্রিম দিয়ে দাড়িটা কামাতেই লেগেছে পুরো তিনটাকা। গলফ্ ক্লাবের গায়ে নির্জন রাস্তাটায় এগিয়ে আসতে আসতে কেমন চাপা-কান্না কানে গেল সঞ্জয়ের। শিখা কাঁদছে। আর মহুয়া গজ গজ করে কী বলছে।

সঞ্জয় আর থাকতে পারেনি। সিধে ঘরে ঢুকে সুইচটা টিপে আলো জেবলে দিয়ে বলেছে, শোনে শিখা, তুমি আর কেঁদো না। আমি তোমার মা মহুয়াকে বিয়ে করছি না। আমি চলে যাচ্ছি—

শিখা তার ছোট ঘরটায় টেবিলের সামনে বসে কাঁদছিল। দুই কনুই টেবিলে রেখে। মুখখানি দুই হাতের ভেতর চেপে ধরে। রাতে ও-ঘরেই সঞ্জয় শোয় আজকাল। এ বছর যে শীতটা আগে-আগে চলে এল। নয়ত বারান্দাতেই শুতে আরাম পায় সঞ্জয়। বড় ঘরের আলো গিয়ে শিখার টেবিলে পড়েছে।

সঞ্জয়ের কথায় চোখ তুলে চাইল শিখা। কান্নায় মুখ ফুলে উঠেছে। বড় ঘরের কোন্ দিক থেকে—বুঝতে পারল না সঞ্জয়—মহুয়া ছুটে এসে তার হাত ধরল। আমাদের মা-মেয়ের সব কথায় তোমার থাকার কী দরকার? তুমি এখান থেকে কোথাও যাবে না। দর্জির ওখান থেকে পাঞ্জাবিটা আনলে না? আজই তো ডেলিভারি দেবার কথা—

এরপর সারাটা সন্ধে এ-বাড়িতে কেউ কথা বলেনি। রাতে খেতে বসার আগে মহুয়া একবার ডেকেছিল, এই শিখা, খাবি আয়। খাটে উপুড় হয়ে থাকা শিখা বলেছে, খিদে নেই।

তা হলে আমারও খিদে নেই,—বলে থালা ফেলে উঠে গেছে মহুয়া। সঞ্জয় উঠতে পারেনি। তার খুব খিদে পেয়েছিল। খেতে খেতে সঞ্জয় দেখল, মা তার মেয়ের পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ল। রাতে শোবার আগে সঞ্জয় ঘরের আলো নিভিয়ে দিল।

এই ভোরবেলায় তুষারের গলা পেয়ে শিখাই আগে উঠল। কিন্তু অন্যদিনের মত সঙ্গে সঙ্গে বারান্দায় বেরিয়ে এল না—যেমন অন্যসময় এসে থাকে।

কীরে? তোরা উঠবিনে? আজ সঞ্জয়ের বিয়ে—

কথাটা তুষারের শিখাকেই বলা। সঞ্জয় অবাক হয়। এই মানুষটা কী মেকের? জড়োসড়োভাব, দুঃখ, ছাড়াছাড়ি, লজ্জা—এসব, বা এই ধাঁচের কোন কথাই তুষারদার ডিকশনারিতে নেই। আছে শুধু জগিং। দৌড়তে দৌড়তে ভোরবেলা চলে আসা। দৌড়তে দৌড়তে ফিরে যাওয়া। ইদানিং তুষারদার পাশাপাশি দৌড়তে দৌড়তে তার সোনালিও আসে। লম্বা জিভ ঝুলিয়ে হ্যাঃ হ্যাঃ করে। বারান্দায় উঠে শিখার পা চেটে দেয় টুক করে। মহুয়াকে ঘিরে দৌড়ের ঝোঁকে পাক খায়। কী মনে ক'রে তুষারদা আজ সোনালিকে আনেনি।

একেবারে চা করে এনে বারান্দায় বেরুল মহুয়া। সঞ্জয় তো দেখে চোখ ফেরাতে পারে না। একেবারে নতুন একখানি লাল ডুরে। চায়ের কাপও নতুন। চুমুক দিয়ে সঞ্জয় বুঝল, এমন চা আগে সে কখনও খায়নি। যেমনি সুগন্ধী—তেমনি লিকার। নিশ্চয় ফেব্রিকের কাজ জমা দিয়ে ফেরার পথে বেশি দামের চা কিনে ফিরেছে মহুয়া।

তুষারও মহুয়ার দিকে না তাকিয়ে পারল না। মহুয়ার এই চা দেবার ভঙ্গি তুষারের অজানা নয়। মহুয়া এ ভাবেই চা দেয়। আসলে যে কোন বউই—চা বা জল নিয়ে এভাবে বারান্দায় আসে—ঘরে ঢোকে। তপতীও এইভাবেই চা নিয়ে তুষারের কাছে আসত।

মুখে কোন ক্ষোভ নেই, চোখে কোন নালিশ নেই, মুখ কোথাও

কোঁচকায়নি—এমন ভঙ্গিতে মহুয়া কী ভাবে চা নিয়ে আসে—অবাক হয়ে ভাবনাটা পলকে তুষারের মনে উঁকি দেয়। মহুয়ার মুখ এখন শান্ত। আজ সে সঞ্জয়ের সঙ্গে বিয়ের পাত্রী। যেন বা একটা শান্ত লজ্জা—সামান্য কুণ্ঠা হয়ে শাড়ির সঙ্গে মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছে। যেন বা বেশি বয়সে বিয়ের কনে হতে হওয়াতে মহুয়ার মুখ—সারা শরীর জুড়ে এই শান্ত ভাব।

তপতী বলেছিল—তুষার, তোমাকে মহুয়ার ডিভোর্স দিতেই হবে। শুধু শুধু তোমায় আঁকড়ে রয়েছে কেন? চলে গেলেই পারে—

তুষার খুলে বলতে পারেনি তপতীকে। তার কথাটা ছিল এরকম ঃ একজন মানুষকে আমি চলে যেতে বলতে পারি না তপতী—সে যতক্ষণ না নিজের থেকে বুঝে চলে যায়, ততক্ষণ আমি চুপ করে থাকব।

এত কথা তুষার তপতীকে বলেনি। শুধু বলেছে—হ্যাঁ তাই তো, মহুয়ার তো এরকম অবস্থায় চলে যাওয়াই ভাল।

শেষে অবশ্য তুষার মহুয়াকে বলেছে, আমাকে ডিভোর্স দাও।

মহুয়ার কথা একটাই। যা ইচ্ছে করো—ডিভোর্স আমি কিছুতেই দেব না। তুমি ইচ্ছে করলে আলাদা বাড়ি ভাড়া করে তপতীর সঙ্গে থাকতে পার। আমি তো আয় করি না। আমার সব খরচই তোমায় দিতে হবে।

তা দেব মহুয়া। দেওয়াটা আমি আমার কর্তব্য মনে করি।

তুষারকে থামিয়ে দিয়ে মহুয়া ঠোঁট বাঁকিয়ে বলেছিল,—শুধু কর্তব্য।

থতমত খেয়ে তুষার বলেছিল, না, তা নয়। তোমাকেও আমি ভালবাসি! শিখাকে না দেখে থাকতে পারি না।

সব সয়ে যাবে আস্তে আস্তে। 'আমাকেও' ভালবাস!

তুমি ডিভোর্স দাও মহুয়া—আমি আগের মতই সবকিছু করব। তোমাদের জন্যে আমি সবসময় চিন্তা করি।

তা তো করই। দেখেই বুঝতে পারছি।

যে ঠাট্টাই কর—আমি সব সময় তোমাদের জন্য ভাবি। আমি গেলে তোমাদের কী হবে কীভাবে থাকবে—সবই আমি ভাবি।

যাবে কোথায়? যাচ্ছই বা কোথায়? থাকবে তো এই কলকাতাতেই, ইচ্ছে হলেই দেখা হবে। আমি কিছুতেই ডিভোর্স দিচ্ছি না। তুমি যা ইচ্ছে করতে পার।

ডিভোর্স দাও মহুয়া। তাহলে আমি আগের মতই তোমার স্বামীই থাকব। আইনের চোখে হয়ত নয়—কিন্তু তোমার-আমার ভেতর সেই স্বামী-স্ত্রীর দায়দায়িত্ব থাকবেই।

শুধু দায়দায়িত্ব? আর কিছু নয়? মহুয়া গেয়ে উঠেছিল: যদি সুন্দর একখান মুখ পাইতাম—এতদিনে সেই সুন্দর একখান মুখ পেয়েছ তা হলে? কী বল! খিলি পান খাইয়েছে তপতী?

মহুয়ার একটি কথায় তুষার পলকে ভোরবেলার নির্জন রাস্তার গায়ে এই ভাড়াবাড়ির বারান্দায় ফিরে এল।

মহুয়া বলল, চিনি ঠিক হয়েছে?

তুষার মুখে দিয়েই বুঝতে পেরেছে—চিনি একদম পারফেক্ট। কত বছর মহুয়া তাকে এভাবে চা দিয়ে এসেছে। চোখে পড়ল, ঘুম থেকে উঠে শিখা মাথা আঁচড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। কিছুদিন হল শখ করে মায়ের শাড়ি পরে মাঝে মধ্যে। আজ ভোরে মহুয়ার একখানা শাড়ি পরেছে। এ শাড়িখানা তুষারের চেনা। দুর্গাপুরে একটা এগজিবিশন থেকে কিনেছিল তুষার। অন্তত দশ বছর আগে। তসরের সুতোর কাজ। একটু ডিসকালার হয়নি। কিছু না বলে মাথা নাড়ল তুষার।

এসব কী চিন্তা ঘিরে আসছে? তুষার সাবধান হতে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল। আরে! তোমরা রেডি হবে কখন? যাও সঞ্জয়। চান করে নাও। রেডি হবে না মহুয়া?

ঘরের ভেতর থেকে গলা তুলে মহুয়া বলল, আমার রেডি হতে কতক্ষণ?

সঞ্জয় ঘোষালের মনে মনে হাসি পেল। আজ আমার বিয়ে?

না, বলি দেবার আগে আমায় চান করে নিতে বলা হচ্ছে ?

শিখা যেমন দাঁড়িয়ে ছিল—তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। মুখে কোন কথা নেই। হাসি নেই। বিরক্তি নেই। বারান্দায় ধাপের ওপর বসা তুষার সরকার আড়চোখে তার মেয়ের মুখখানি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে।

এগার

ফুলের মালা যারা দিয়েছে—তাদেরই দু'জন লোক বেলা ন'টার ভেতর দুটি সাইকেলে এসে রজনীগন্ধার স্টিক, জুঁই আর বেলি ফুলের তোড়া ছাড়াও গোলাপের বড় বড় ছ'টি তোড়া দিয়ে গেল। দশটার ভেতর এসে গেল ক্যাটারার। জনা দশেকের জন্য ফ্রায়েড রাইস থেকে রসগোল্লা সবই গুছিয়ে দিয়ে চলে গেল। সবই তুষারের অ্যারেঞ্জমেণ্ট।

প্রায় পুরোহিতের কায়দায় তুষার যখন ডাকল, কোথায় ? মহুয়া ? সঞ্জয় ? তোমাদের সাজগোজ হল ?—ঘরের মাঝখানটায় একমেব চেয়ারে বসা তুষার সরকার তখন তার পেছনে ছোট ঘরটার দোর বন্ধ করার শব্দ পেল। একদম দড়াম করে। পেছনে না তাকিয়েই তুষার বুঝল, শিখা ছোটঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। বেশ শব্দ করে।

তখন কলতলার দিকে রান্নাঘরের বারান্দা থেকে নতুন শাড়ির সপসপ শব্দ তুলে আর গন্ধ ছড়িয়ে মহুয়া ঘরে ঢুকল। গায়ের ব্লাউজটিও নতুন। চোখে কাজল। কপালে চন্দনের টিপও গুছিয়ে দিয়েছে মহুয়া। শাড়ি ব্লাউজ দেখে মনে মনে তুষার সঞ্জয়ের প্রশংসাই করল। পাঁচশ টাকা সঞ্জয়ের হাতে দিয়ে তুষার বলে দিয়েছিল, তোমার পছন্দ মত কিনো। সত্যিই পছন্দ আছে সঞ্জয়ের। সত্যিই সঞ্জয় মহুয়াকে ভালবাসে। নয়ত এত মানানসই শাড়ি-ব্লাউজ ওর মাথাতেই আসত না।

সঞ্জয় ঘরে ঢুকল নতুন ধুতি-পাঞ্জাবি পরে। মুখে একটু লজ্জা লজ্জা ভাব। শিখা গিয়ে ছোট ঘরটার দখল নেওয়ায় মহুয়া সেজেছে রান্নাঘরে আলো জ্বালিয়ে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। আর সঞ্জয় রান্নাঘরের সামনে ছোট্ট ঢাকা বারান্দায় দাঁড়িয়ে।

মহুয়া সেজে বেরিয়ে আসার সময় একটু আগে সঞ্জয়ের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। দেখি তোমার কপালটা—

ধুতি পরতে পরতে সঞ্জয় জানতে চেয়েছিল, কেন ?

দেখি কাছে এসো। একটা চন্দনের ফোঁটা নাও। আজ একটা শুভদিন তোমার জীবনে—

তোমার জীবনে ?

কোন জবাব দেয়নি মহুয়া। সিধে এসে বড় ঘরটায় ঢুকে পড়েছে।

দু'জনে এসে তুষার সরকারের মুখোমুখি খাটে—পাশাপাশি বসল। তুষার আগেই বিছানার ওপর ঠিক মাঝখানটায় মালাক'টি রেখে দিয়েছে। বাকি ফুল মহুয়ার ফেব্রিকের কাজকর্মের রঙের বাক্সের ওপর।

পাকা ম্যাচমেকারের কায়দায় তুষার পকেট থেকে একটা কৌটো বের করে সঞ্জয়ের হাতে দিল। সিঁদুর পরিয়ে দাও মহুয়াকে।

সঞ্জয় কাঁপা কাঁপা হাতে মহুয়ার কপালে সিঁদুরের টিপ দিল। সিঁথিতে সিঁদুর টেনে দিল। দিতে দিতে দেখল, মহুয়ার কপালের ডানদিকে একটা শিরা ফুলে উঠেছে। এভাবেই মহুয়ার মাথা ধরে তা জানে সঞ্জয়। আর দেখল—যে-সিঁথিতে সে এইমাত্র সিঁদুর টেনে দিল—সেখানটায় মাথার চুল কিছু পাতলা—সিঁথিতে সিঁদুর পরার আগেকার অভ্যেস থেকে।

তুষার বলল, এবার দুজনে দু'টি মালা নাও। দু'জন দু'জনকে পরিয়ে দাও।

সঞ্জয় একটি মালা নিল। মহুয়া একটি।

সঞ্জয় মহুয়ার গলায় পরিয়ে দিল। মহুয়া সঞ্জয়ের গলায় পরিয়ে দিতে গিয়ে থামল। তুষারের দিকে তাকিয়ে বলল, এ-বিয়ে

কিন্তু আইনে টিকবে না—

তুষার সরকারের সব সময়েই একটা ডোণ্ট পরোয়া ভাব। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পাকা অ্যাথলেটের মত ডান পা এগিয়ে দিয়ে নাচাতে নাচাতে বলল, তোমার-আমার আইনি বিয়ে কি টিকলো মহুয়া ?

মহুয়া তবু বলল, আইনের চোখে আমি এখনও তোমার বউ।

তোমার আর সঞ্জয়ের ভেতর ভালবাসা থাকলে—আণ্ডারস্ট্যাডিং থাকলে আইন তোমাদের ছুঁতেও পারবে না। আর যদি না থাকে—

কথা শেষ করল না তুষার সরকার।

তাকে ঘিরেই পুরো ব্যাপারটা যেন এক বড় ইয়ার্কি। তাই মনে হচ্ছে সঞ্জয়ের। সিঁথিতে সিঁদুর টেনে দেওয়ার পরেও এসব কথা কোত্থেকে আসে মহুয়ার ঠোঁটে? মুখে কিন্তু কোন ভাবলেশ নেই মহুয়ার। বরং পেশাদারী শান্ত গলায় কথা বলছে মহুয়া। সঞ্জয়ের ভেতরটা জুড়ে মহুয়ার কথাগুলো বড় হয়ে চারদিক ভরাট করে দিচ্ছে। আইনের চোখে আমি এখনও তোমার বউ। একথা বলল কেন মহুয়া। মহুয়া এ ক'মাসে আমার সঙ্গে যেভাবে মিশেছে, তাতে তো বলা যায় ও আমাকে ভালইবাসে—রীতিমত ভালবাসে। তবে কি তুষারদাকে টাইট দিতে—তুষারদার ওপর শোধ তুলতে—তুষারদার জীবনে বঁড়শি হয়ে বিঁধে থাকতে মহুয়ার মুখে এসব কথা ?

চলি—বলে তুষার সরকার ঘুরে দাঁড়াল।

সঞ্জয় বলল, কোথায় যাবেন এখন ? এত খাবার এনেছেন—কে খাবে ?

তুষার বলল, আজ তোমরা রান্না করবে না। খাবে আর গল্প করবে।

মহুয়া শান্ত গলায় বলল, আজ শুভদিন। কিছু মুখে দিয়ে যাও। আমি দিচ্ছি।

শিখাকে ডাকি—

মহুয়া প্যাকেট খুলছিল। অঢেল খাবার। প্লেটে খানিকটা ফ্রায়েড রাইস আর মাংস নামিয়ে দিতে দিতে বলল, ও কি আসবে?

শিখাকে নিয়ে আজ সারাদিন ঘুরব। সিনেমা দেখব দু'জনে। এই শিখা—শিখা—

মহুয়া জানতে চাইল, তপতী কোথায়?

বাপের বাড়ি গেছে। শিখা—বলে ডাকতে ডাকতে ছোটঘরের দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিল তুষার।

এত খাবার। এত ফুল। কেউ খাবার নেই। ফুল নিয়ে আনন্দ করারও কেউ নেই। সবটাই কেমন চাপিয়ে দেওয়া মনে হচ্ছে সঞ্জয়ের।

ছোটঘরের দরজা খুলে শিখা বেরিয়ে এল।

চল্। আমি আর তুই আজ সারাদিন ঘুরে বেড়াব।

চলো—

কিছু খেয়ে নিই, আয়। মহুয়া দাও তো।

শিখা বেঁকে বসল, আমার খিদে নেই।

দিব্যি ফের সেই অ্যাথলেটের ভঙ্গিতে তুষার ডান পা এগিয়ে যেন একটু একটু নাচাতে লাগল। মুখে একটা হাসি ঝরে পড়ছে। সঞ্জয়ের মনে হল, এইসব সময় তুষারদাও মুখে চুইংগাম নিয়ে চিবোতে থাকলে খুব সই সই মানিয়ে যায় মানুষটাকে।

তুষার বলল, তা কী করে হয় শিখা। কাল রাতে খাসনি কিছু। দাও তো মহুয়া। ভাল করে খেয়ে নিই দু'জনে।

মহুয়া সবকিছু ভাল করে প্লেটে সাজিয়ে এগিয়ে দিল দু'জনকে। একজন তার মেয়ে। অন্যজন এই সেদিনও তার স্বামী ছিল। দু'জনেই কী খায়—কী খেতে ভালবাসে, তা খুব ভাল করেই জানে মহুয়া। সবকিছু দেবার পর তুষারের প্লেটে দুটি কাঁচালংকা দিল মহুয়া। তুষার মাথা নিচু করে খাচ্ছিল। কাঁচালংকা দেখেই সে মহুয়ার মুখে তাকাল। শিখা খেতে খেতে সেই তাকানোটাও চোখ তুলে দেখল।

সঞ্জয় কোনদিন এত সাজগোজ করেনি। এত ভাল জামাকাপড়

পরেনি। সে আগ বাড়িয়ে শিখাকে বলল, মনে হচ্ছে ছোলার ডালটা ভাল হয়েছে। আরেকটু দিক ?

না—

শিখাকে নিয়ে তুষার বেরিয়ে গেল। মহুয়া দেখল, বেরোবার সময় শিখা একবারের জন্যেও ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল না, মা ঘুরে আসি—

একঘর খাবার—ফুলের ভেতর, ফুলের মালার ভেতর, গোলাপ তোড়ার ছড়াছড়ির সামনে সঞ্জয় যেন বেকুব বনে গেছে। বাইরে রাস্তায় সুন্দর রোদ্দুর। একটা সাইকেল রিকশা গেল।

ও কী ? আজ ওভাবে বসে থাকে নাকি কেউ ? এসো—বলে দু'খানি হাত মেলে ধরল মহুয়া। এতক্ষণ নিজেকে সঞ্জয়ের এখানে বাইরের লোক মনে হচ্ছিল। এবার মহুয়ার এগিয়ে দেওয়া দু'খানি হাত দেখে মনটা কেমন ঢেউ হয়ে আনন্দে ভেসে গেল সঞ্জয়ের।

দু'জনই দু'জনকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছে না। অথচ এইমাত্র দু'জনেরই নতুন জীবন শুরু হল।

সঞ্জয় হঠাৎ বলল, তপতীদির চেয়ে তুমি কম কিসে মহুয়া ?

কী জানি। আমি তো বুঝি না সঞ্জয়। ভাল চাকরি করে তপতী। গ্র্যাজুয়েট। আলাদা একটা চটক আছে চেহারায়।

ধুস্‌ চাকরি। গুলি মারো গ্র্যাজুয়েটে। তুমি কী সুন্দর, কতটা লম্বা। আমি তো লুকিয়ে দেখি—আর চোখ ফেরাতে পারি না মহুয়া—

ভীষণ আনন্দে মহুয়া কোনরকমে বলতে পারল, তাই ?

আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না—তুমি আমার। তোমার হেঁটে আসার শব্দ—হাসি—যখন কিছু আমাকে বারণ কর—তোমার তখনকার গলার স্বর—আমার ভীষণ ভাল লাগে মহুয়া।

মহুয়া কোন কথা বলতে পারছে না। সে টের পাচ্ছে—তুষারের তুলনায় সঞ্জয়ের শরীরে মাংস কম। ওর কাঁধের একটা হাড় মহুয়ার গায়ে বিঁধছে। তবু এই কাঁঠ কাঁঠ ভাব তার ভাল লাগে। চশমা

চোখে সঞ্জয় যেন কিছু দেখতে পায় না। কাচের ওপার থেকে এমন করেই তাকাবে—সঞ্জয় যেন কিছু হাতড়াচ্ছে। এই সময় ওকে কিছু এগিয়ে দিতে ভাল লাগে মহুয়ার।

শোনো সঞ্জয়। আমি কিন্তু তোমার তুষারদাকে ডিভোর্স দিইনি।

তা তো শুনলাম। বললে তো। আমি অত-শত বুঝি না মহুয়া। আমি বুঝি তুমি আমার।

তা বললে চলবে কেন? তোমাকে সবই জানতে হবে। আজ থেকে তুমি আমার স্বামী।

সঞ্জয় মহুয়াকে ছেড়ে দিয়ে গলফ্ ক্লাবের মাঠের দিককার জানালায় গিয়ে দাঁড়াল। এই সময়টায় ক্লাবের মালিরা মো-মেশিন টেনে টেনে ঘাসের মাথা ছাঁটে। বাড়ির সামনেটা নির্জন। তবে পাশের ভাড়াটেরা কী একটা আন্দাজ করে মাঝে মধ্যে উঁকি দিচ্ছে। বিশেষ করে একাজটা করছে ওদের একটা লম্বা ট্যানটেনে মেয়ে। ওদের বারান্দা থেকে এ-ঘরে ফুলভর্তি খাটটা দেখা যায়।

সঞ্জয় বলল, আমার ভয় করছে। আমি সামান্য মাইনে পাই আগরপাড়ার চাকরিতে। তুমি হয়ত চলে যেতে পার মহুয়া। তবু আমি এ বিয়ে খুবই খাঁটি মনে করি। এসো—

দরজা জানালা সব খোলা....বলতে বলতে মহুয়া গিয়ে রাস্তার দিককার দরজায় ছিটকিনি তুলে দিল। তারপর জানালার পরদা টেনে নামিয়ে দিল।

রাত আটটা নাগাদ শিখাকে নিয়ে ফিরছিল তুষার। আজ অনেকদিন পরে শিখা তুষারকে একা পেয়েছে। আজ যেন দু'জনের ভেতরকার খোলামেলা ভাবটাও ফিরে এসেছে।

অটোতে অশোকনগরে নেমে তুষার বলল, হেঁটে যেতে পারবি?

খুব। তোমার সঙ্গে হাঁটতে আমার ভাল লাগে।

চল্ তাহলে দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে যাই।

শীত আসবে শিগগির। রাত তেমন নয়—অথচ পান-বিড়ির

দোকানগুলোও ঝাঁপ বন্ধ করেছে। রাস্তা ফাঁকা। তুষার যেন পায়রার পালক। পরদিন ট্যাং ট্যাং করে ঘুরেও এখন দিব্যি উড়ে চলেছে।

দাঁড়াও বাবা। আমি অত তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারি না।

জুতো ঠিক আছে তো? বলে দাঁড়িয়ে পড়ল তুষার। শিখা এসে ওকে ধরতে তুষার বলল, আজ থেকে সঞ্জয় তোমার বাবা।

ধ্যাৎ! বলেই শিখা ভাল করে ধরল তুষারকে। একটা গান করো বাবা।

আমি তো বেশি গান জানি না। দেখিস—সামনে গর্ত। কেন স্ট্রিট লাইট জ্বলে না—

যে কোন একটা গান গাও না বাবা।

খুব চাপা গলায় ধরল তুষার। প্রায় গুনগুন করে—

যদি সুন্দর-র একখান্ মুখ পাইতাম—

তো এক খিলি পানো-ও বনাইয়া খাওয়াইতাম—

যদি সুন্দর-র একখান্ মুখ—

খিলখিল করে হেসে উঠে শিখা নার্ভাস করে দিল তুষারকে। তুষার থেমে পড়ল। রাস্তার দু'পাশে এলোমেলো বাড়ি। দরজা জানলাটা ভেতর থেকে টিভি-র দমবন্ধ গলা। আজ যে শিখার মায়ের ফের বিয়ে হয়ে গেল—তার কোন ছাপ পড়েনি শিখার হাসিতে—হাঁটায়—কথা বলায়।

তুমি কি সারাজীবন একখানা সুন্দর মুখ খুঁজে বেড়াচ্ছ?

কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছে না। তুষারের গলা যেন অস্পষ্ট হয়ে গেল। সে বেশ নিচু স্বরে বলল, আমরা সবাই তো তাই খুঁজি শিখা!

শিখা ঠাট্টা করে বলল, ও। তাই বুঝি? জানতাম না।

খুব জানিস। সবাই জানে। সবাই তাই খোঁজে।

তুমি এখনও পাওনি বাবা?

জানি না। খুঁজি আর কোথায়! সারাটা দিন তো চলে যায় হলিডে-ইনের প্লাম্বিং-এ।

গলফ্ ক্লাবের পাঁচিলের গায়ের রাস্তাটা বিকেলে কিছুটা জমজমাট হয়ে ওঠে। আশপাশ তো বটেই—নেতাজি সুভাষ রোড, গলফ্ গ্রীন, আজাদগড়, রানীকুঠি, জুবিলি পার্ক, গ্রাহামস ল্যান্ড—অনেক জায়গার ছেলেরা মেয়েরা খেলতে আসে। ফুটবল তো আছেই। আছে ক্রিকেট। দৌড় প্র্যাকটিস। তারপর মাঠের একধারে বসে জোড়ায় জোড়ায় গুলতানি।

সারাটা দুপুর থেকে বিকেল পেরিয়ে গিয়েও মহুয়া সঞ্জয়ের হাতের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে থাকল। কখনও দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করে। আবার হাতে ব্যথা লাগলে—শোয়ার অসুবিধে হলে সামান্য সরে শোয়া। এইভাবে বেশ কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে অন্ধকার সন্ধে রাতে বিছানায় উঠে বসল সঞ্জয়। মনে মনে ভাবল ঃ কাশ্মীরে বেড়াতে এসেছি। ডাল লেকে শিকারায় মহুয়ার পাশে এতক্ষণ শুয়ে ছিলাম। ওর ঘুম ভাঙলেই শিকারাওয়ালা আমাদের জন্যে সুন্দর সুন্দর পেয়ালা পিরিজ সাজিয়ে চা এনে দেবে। মহুয়া চা ঢেলে পয়লা পেয়ালা আমার সামনে ধরবে।

খানিক বাদে মহুয়া আড়মোড়া ভেঙে বাঁ হাতখানা সঞ্জয়ের কোলে রাখল। এই হাতে মশা বসায় মহুয়া একদিন চড় মেরে মশাটা মেরেছিল। তখন সুডৌল হাতের দিকে সঞ্জয় তাকিয়ে ছিল। সেকথা মনে পড়তেই সঞ্জয় বুঝল, সে শিকারায় বসে নেই। বসে আছে তক্তপোশে। পাতলা তোশকের ওপর। সে কাজ করে আগরপাড়ায়। খুব সামান্য মাইনে পায় সেখানে। মহুয়ার ফেরিকের কাজের টাকাতেও তাদের কুলোবে না—যদি তুষারদা টাকা দেওয়া বন্ধ করে।

রাস্তা থেকেই গমগমে গলায় কথা বলতে বলতে তুষার সরকার বারান্দায় উঠে আসছিল। সে গলা কানে যেতেই মহুয়া তড়াক করে উঠে বসল। অন্ধকারেই একদৌড়ে কলতলায় চলে গেল।

ঠিক এই সময় শিখাকে নিয়ে ঘরে ঢুকল তুষার। আবছা অন্ধকারে সঞ্জয়কে বসে থাকতে দেখে বলে উঠল; অন্ধকারে বসে আছ? আলো জ্বালনি?

তুষার সুইচ খুঁজে পাচ্ছে না দেখে শিখা আলো জেবলে দিল। মা নেই। সে আশেপাশে তাকাতেই দেখল তার মা কলতলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠছে।

তুষার চেঁচিয়ে উঠল। এ কী, খাবারগুলো যে খোলইনি দেখছি।

সঞ্জয় বলল, এত খাবার দু'জনে খাওয়া যায়! আপনি বসুন।

মহুয়া বলল, তোমরা খাও। ভাল করে। নয়ত এত খাবার নষ্ট হবে।

তুষার হা হা করে হেসে উঠল। খাবার নষ্ট করব কেন? বাইরে আমি আর শিখা টুকটাক খেয়েছি। তবে হেঁটেছিও অনেকটা—

ঘরের দুটো আলো জেবলে দিয়ে সবার মত খাবার সাজাল মহুয়া। মেঝেতে। বসতে হবে পুরনো খবরের কাগজে কিন্তু।

মহুয়ার এ-কথায় সবার আগে কাগজ পেতে বসে পড়ল তুষার। তার এক পাশে সঞ্জয়। আরেক পাশে শিখা। বসার ব্যাপারটা তুষার ছবির মতই করল। সে যেমনি সহজে উঠে দাঁড়ায়, ঠিক তেমনি সহজেই টুক করে বসে পড়তে পারে। শরীরটা তার কাছে গুটিয়ে নেওয়া বা ছড়িয়ে দেবার জিনিস। কোথাও একটুও আটকায় না। খাবার কিন্তু বেছে বেছে খেতে লাগল। নিজেই বলল, নো কার্বোহাইড্রেট। স্যালাড দাও। মাংস দাও।

সঞ্জয়ের ওসব বাছবিচার নেই। সে সবই খাচ্ছে। তার বারবার মনে হচ্ছে—সে যেন কোন নৌকোয় ভাসছে। নৌকোটা যেকোন সময় ডুবে যেতে পারে।

শিখা নিল মাছ। একটা পিস। মহুয়া জোর করায় আরেক পিস। সামান্য ফ্রায়েড রাইস। মহুয়া একখানি পেটির মাছ খেয়ে উঠে গেল হাত ধুতে। সবার আগে।

খেয়ে উঠে তুষার বলল, ও কার জন্যে খাবার বাঁধছ?

তোমার জন্যে। তপতী তো বাপের বাড়ি গেছে।

বাঃ! আমি যে পেট পুরে খেয়ে গেলাম।

যদি খিদে পায়।

না না অত দিও না মহুয়া।

মহুয়া বলল, বেশি দিইনি। যা থাকবে ফ্রিজে তুলে দিও। এখানে তো ফ্রিজ নেই। অবশ্য এখন তত গরমও নেই। এখানে যা থাকল তা কাল দুপুর অব্দি দিব্যি রাখা যাবে। কাল আর বাজার বা রান্নার ঝামেলা থাকল না।

দু'জনের এই কথা বলা—খাবারের ভাগ বাঁটোয়ারা আর-দু'জন কান দিয়ে শুনছিল। চোখ দিয়ে দেখছিল। শিখা আর সঞ্জয়। দু'জনই কি এইসব দেখেশুনে মনে মনে এই কথাটিই বলছিল—কেন এই আলাদা হওয়া? কেনই বা আবার আলাদা আলাদা করে বিয়ে সাদি? কেউ তো আগের কথা কিছুই ভোলনি। কিন্তু বাইরে থেকে শুধু মুখ দেখে মন জানা বড় কঠিন কাজ।

এখন গলফ্ ক্লাবের মাঠে রাত আটটা ন'টার পর ঝিঁঝি কমই ডাকে। বর্ষাকালে ওরা সারারাত একটুও কামাই দেয় না। তার তুষারদাকে জুবিলি পার্কের রাস্তাটা ধরিয়ে দিয়ে ফেরার পথে ঝিঁঝি নিয়ে এই তথ্যটি আবিষ্কারের আনন্দে মশগুল হয়ে পড়ল সঞ্জয়।

বারান্দায় উঠেই দেখল, শিখা গিয়ে একা মোড়া পেতে অন্ধকারে বসে। সঞ্জয় বলল, তোমার ছোটঘরে তোমার পড়ার টেবিলে গিয়ে বোসো শিখা। ও-ঘর তো তোমারই। আমি শুধু রাতে শোব। তোমার পড়াশুনো হয়ে যাবার পর। যেমন রোজ শুয়ে থাকি।

না। এখন থেকে রাতেও আমি ও-ঘরেই শোব। ওটা শুধু আমারই ঘর।

সঞ্জয় ঘোষাল শিখার বাবা নয়। গোড়ায় এ বাড়িতে তার রাতে শোবার জায়গা হয়েছিল বারান্দায়। বৃষ্টির দরুন প্রোমোশন পেয়ে রাতে সে শুচ্ছিল শিখার ছোটঘরে। পাছে শিখার পড়াশুনো, ওঠাবসার অসুবিধে হয়, জায়গার অভাব হয়—তাই সঞ্জয় তুষারকে এগিয়ে দিয়ে এসে শিখাকে একা বসে থাকতে দেখে ওকথা বলে। কিন্তু শিখা একী বলল?

মহুয়াকে সিঁদুর পরিয়ে—মহুয়ার গলায় মালা দিয়ে নিজের মত করে সঞ্জয় আজ মহুয়াকে বিয়ে করেছে। নতুন ঘিয়ে-রঙের পাঞ্জাবিটা এখনও তার গায়ে। সেই সকাল থেকেই পরে আছে। আজ দিনটাই অন্যরকম।

বড় ঘরের ভেতর ঢুকতে ঢুকতে মহুয়া চোখের ভাষায় তাকে কাছে ডাকল। সঞ্জয় কাছে যেতে মহুয়া চাপা গলায় বলল, আজ তুমি বিয়ে করলে সঞ্জয়—ঘটে কি একটুও বুদ্ধি নেই তোমার? এই বুদ্ধি নিয়ে বাড়ির দালালি করতে কী করে?

কেন? কেন?

আমার বিয়ের পর মা-মেয়েতে আমরা কি আর একসঙ্গে শুতে পারি? কেন আগবাড়িয়ে ওসব কথা শিখাকে বলতে যাওয়া আমি বুঝতে পারি না। ও তো বড় হচ্ছে।

অনেক রাতে মশারির ভেতর ঘুম ভেঙে গেল মহুয়ার। এখানে মশাগুলো নাকি শীতের শুরুতে বেশি আসে। আবার আসে গরমের শুরুতে। এখনও এ-ক'টা বছর থেকেও সব জানা হয়নি মহুয়াদের। আস্তে করে তার বুকের ওপর থেকে সঞ্জয়ের হাত নামিয়ে দিল মহুয়া।

কলতলা থেকে ফিরে জল খেয়ে জানালা দিয়ে মহুয়া গলফ্ ক্লাবের মাঠ দেখতে পেল। দুধের পাতলা সর হয়ে সেখানে জ্যোৎস্না পড়ে আছে। আরে। শিখার মশারি টানিয়েছিলাম তো? সোজা গিয়ে শিখার ঘরের ভেজানো দরজা ঠেলল মহুয়া। আস্তে করে। হাফ ছাড়ল মহুয়া। হ্যাঁ টানিয়েছি। টেবিল ল্যাম্পটা জ্বলছে। নেভাতে ভুলে গেছে শিখা। নিভিয়ে দিতে গিয়ে মহুয়া দেখল—বিছানায় শিখা নেই।

কোথায় গেল? মাথা ঘুরে গেল মহুয়ার। মহুয়া তাড়াতাড়িতে ছোটঘর দিয়ে বাইরের বারান্দায় যাবার দরজায় এসে দাঁড়াল। খোলা। এ-দরজা সারাদিনই বন্ধ থাকে। খুব দরকার না পড়লে খোলা হয় না।

মহুয়া উঁকি দিল বারান্দায়। ছোট মোড়াটায় শিখা একা বসে। দুই হাঁটুর ওপর কনুই রেখে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে উঠছে। কোন শব্দ নেই এই কান্নার। মহুয়া কিছুতেই নিজের মেয়ের কাছে যেতে পারল না।

বারো

হলিডে-ইনের রিসেপশন থেকে বেরোতে বেরোতে তপতী দূর থেকে তুষারকে দেখতে পেল। কিচেনে যাবার বেসমেণ্টে নেমে এসে সে মেশিনঘরে তাকাল। সেই ঢ্যাঙা লোকটা দাঁড়িয়ে। মাথার চুল ক্রুকাট—কালো আঁকা গোঁফ যেন নাকের নিচে—ঘাড় ঘোরালে কাঁধের হাড়—চিবুকের হাড়—গলার হাড়—সবই একসঙ্গে জেগে ওঠে ঢ্যাঙার। কোন কথা না বলে এমন করেই তাকিয়ে থাকে—যাতে রিসেপশনে ঠান্ডায় মোলায়েম আলোর ভেতরে বসে থাকা তপতী পরিষ্কার বুঝতে পারে—ঢ্যাঙা তাকে ভীষণ চায়। এখুনি চায়। পারলে তাকে পেড়ে ফেলে ছিঁড়েখুঁড়ে দেখে।

হলিডে-ইনের হোটেলবাড়ির এই দেড়তলা মার্কা বেসমেণ্টের চারদিকে গাদাগুচ্ছের মোটা মোটা পাইপ। জলের। গ্যাসের। তাতে নানা রকমের জয়েনার। চাকা লাগানো মাঝে মাঝে। পাতালের দিকে কোত্থেকে সবসময় একটা ইঞ্জিন চলার আওয়াজ উঠে আসছে। সঙ্গে জলের ছলাৎছল। এসবের ভেতর স্টিলের পাত ফেলে একটি লম্বা করিডর। বলা যায় ইন্সপেকসন ম্যালে। সবার যাতায়াতের জন্যেও দরকার।

সেই করিডরের মাথায়—তুষার সরকার দাঁড়িয়ে ছিল। এই নির্জন করিডরে সে মাঝে মাঝে দৌড়োয়। যেন ওই করিডরই ওর খেলার মাঠ। দূর থেকে আগেও দু'একবার দেখতে পেয়েছে তপতী। অদৃশ্য কী এক সুরে সব সময় তার মনটা বাঁধা যেন। সেই সুরে

তুষার আচমকাই নেচে উঠল। তপতী যে দূরে দাঁড়িয়ে—তা দেখতে পায়নি তুষার।

বাঁদিকে নেমে গেলে কিচেন। ডানদিকে ছ'ধাপ নামলে লম্বা এই করিডর। যার দু'দিকে মোটা মোটা পাইপের জঙ্গল। তপতী দেখল—সেই নির্জন করিডরে একটি চিতাবাঘ আপন মনে দু'হাত শূন্যে মেলে দিয়ে কী এক নাচ নেচে চলেছে। সরু কোমর থেকে ভি মার্কা বুক। নিচের দিকে দুটি পিস্টনের পায়ে দৌড়নোর জন্যতো। চিতা কোন সুরে আছে। সে-সুর শুধু সে-ই শুনতে পাচ্ছে—আর সেইমত ঘুরে ঘুরে একা নাচছে। হালকা। পায়রার পালকের মতই।

তপতী দত্ত চোখ ফেরাতে পারল না। জোরে তুষার বলে ডাকাও যায় না। একবার বলে উঠল—মিস্টার সরকার—

তার গলা অতদূর গেল না। তখন তপতী নিজেই এক ধাপ নেমে করিডরের মুখটায় এসে দাঁড়াল। যদি আনমনা চিতাটার চোখে পড়া যায়। এমন মানুষ, কখনও দেখেনি তপতী। মুখে বিশেষ কথা নেই। কালো চোখ সব সময় স্থির হয়ে আছে। ঠোঁট বন্ধ। চোখই নিঃশব্দে কথা বলছে। তুমি কি আমাকে চাও? আমি তোমাকে চাই। তুমি কি আমাকে চাও? আমি তোমাকে চাই। তপতী লক্ষ্য করেছে—তুষারের মুখোমুখি হলে তার আর তুষারের চোখের মাঝামাঝি সব আলো সব বাতাস এই কথাগুলোয় জ্যাম হয়ে যায়। তুমি কি আমাকে চাও। আমি তোমাকে চাই। অথচ এসব কথার কোনও শব্দ নেই।

তুষার সরকার তখন তার দু'খানি হাত পাখির ডানা করে সামনের দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে কী একটা বয়ে-যাওয়া সুরের সঙ্গে নাচছে। এখানে কেউ নেই। আছে শুধু পাইপ। লোহার খুঁটির গায়ে ফোর ফর্টি ভোল্ট ইলেকট্রিকের সুইচ বক্স। কুলিং প্ল্যান্টে জল ওঠানোর-বের করার নিকাশি মোটা পাইপ। তার হোটেলবাড়ির একটা বদ্ধ দেওয়াল—যার ওপিঠেই ঠাণ্ডা ঘর, দামী খাবার, সুন্দর পোশাক, সুগন্ধী সাবান, দুধ সাদা তোয়ালে, ভদ্রতা, বিদেশী

ডলার—যাকে বলে ষোল আনা আরাম।

তুষার লোহার পাতে বানানো সিঁড়ির তিন ধাপ নেমে করিডরে চলে এল। সে রিসেপশনে কাজ করে। যাকে বলে ফ্রন্ট ডেসকের স্টাফ। হলিডে-ইনে যারা সবচেয়ে সেজেগুজে থাকে। সেখানকার কেউ এখানে আসে না। আসার কথাও নয়। হোটেলের কেউ তাকে এখানে দেখলে অবাকই হবে। লজ্জার মাথা খেয়ে তপতী ডাকল, মিস্টার সরকার—

তুষার শুনতে পেল না।

তখন তপতী আরও অবাক হয়ে বলল, এই তুষারবাবু—

তুষার তার নাচের একাই শিল্পী। একাই দর্শক। তবে চোখ বুঁজে ঘূর্ণী খাওয়ার সময়েও সে যেন নিজেকে দেখতে পায়। এবার তপতীর গলা কানে গেল।

সেরকমই এক ঘূর্ণী মুখে তুষার খচ্ করে থেমে গেল। থেমেই যেন ঘুমন্ত তুষার চোখ খুলে চমকে উঠল প্রথমে—তারপর খুশিতে আনন্দের হাসি হেসে ফেলছিল। নিজেকে অনেক কষ্টে সামলে নিয়ে শান্ত গলায় বলল, আপনি ?

আমি তো আসতেই পারি। আমিও তো হলিডে-ইনের স্টাফ। আপনি সত্যি সত্যি চোখ বুঁজে নাচছিলেন ? সরু করিডরে কোথাও গুঁতো খেয়ে একদম বেসমেণ্টের চাতালে গিয়ে পড়তে পারেন।

আসতে তো পারেনই। নিশ্চয় পারেন।—বলে খুব সেলফ্ কনফিডেন্সে তুষার বলল, এই প্লাম্বিং এলাকার সবকিছু আমার নখদর্পণে। এখানেই প্রায় কুড়ি বছর আছি।

তুষারের মুখের দিকে তাকাল তপতী। মনে মনে বুঝল—বেশ কম বয়সেই তুষার সরকার এখানে ঢুকেছিল। এখন নাচের ঘূর্ণীতে ঘেমে যাচ্ছে। বর্ষা চলে যাওয়ার পরেকার গরম এখানে কম। কেননা সারা হোটেলের পাইপ লাইনের ফাঁকফোকর দিয়ে সবসময় বাতাস খেলে। আপনি কি প্রায়ই এমন নাচেন ?

এ কথায় একটুও লজ্জা পেল না তুষার। কোনও স্টাফই তার

অফিসে এসে নাচে না। এটা নাচের জায়গাও নয়। তুষার বলল, বেশ গাঢ় গলায়, এক একদিন নাচ এসে যায়। এত আনন্দ যে কোত্থেকে আসে মনের ভেতর তা আমি ধরতে পারি না। আনন্দ হলেই নাচ আসে।

খুব আনন্দ হয় বুঝি আপনার ?

তুষার আরও গাঢ় গলায়—তপতীর চোখের ওপর দুই ভ্রূর মাঝখানটায় সিধে তাকিয়ে বলল, আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকেই দেখছি প্রায়ই এমন নাচ আসছে। কোত্থেকে যে এত আনন্দ আসছে! কেন এমন আসছে! কিছুতেই ধরতে পারছি না।

তপতী ঠিক এই সময় নিজেকে কোন আয়নায় দেখলে দেখতে পেত—তার চোখের নিচে গাল কিছু লাল হচ্ছে। সে কোনরকমে বলল, আনন্দ আসছে আর অমনি নাচ এসে যাচ্ছে ?

হ্যাঁ হয়ত আপনার মত রিসেপশনের হলিডে-ইনের ফ্রন্ট ডেস্কের স্টাফ হলে—অবিশ্যি আমার যা বিদ্যেবুদ্ধি তাতে রিসেপশনের স্টাফের চাকরিতে কোনদিনই চান্স পেতাম না—বলতে বলতে কুঁকড়ে থেমে গেল তুষার সরকার।

থামলেন কেন ?—বলুন। আমি শুনতে চাই।

তপতীর এই হুকুমদারী রোখা ভাবটা তুষারকে টানে। সে বলল, আপনার মত ফ্রন্ট ডেস্কে থাকলে আনন্দে নাচ আমার এলেও নিজেকে হয়ত সামলেসুমলে রাখতাম। ওখানে নাচলে পয়লা নাচেই আমার চাকরিটি নট হয়ে যেত।

তুষারের ভীষণ গাঢ় সিরিয়াস গলা—তার সঙ্গে ঘন কালো চোখে পলক না ফেলে কথা বলা—আর ব্যাপারটা হচ্ছে খুব আনন্দ হতেই নাচ এসে যাওয়া—বিশেষ করে হলিডে-ইনের ফ্রন্ট ডেস্কের কাজেই—আগাগোড়া ভাবতেই তপতী হো হো করে হেসে ফেলল।

তুষার সরকার কিন্তু একটুও হাসল না। সে সমান গম্ভীর গলায় বলল, প্লাম্বিংএ অপারেটিং সুপার বলেই—আর আমার কাজের

জায়গা এই করিডরটা একদম নির্জন বলেই আনন্দে নাচ এসে গেলে নিজেকে ধরে রাখি না একদম।

তুষারের গলার স্বর—ঘন কালো চোখে সিধে তাকানো—মাথায় ক্রুকাট ছাঁট—নাকের নিচে মোটা করে আঁকা গোঁফের দুই ঘন লাইন—তপতীর দুই চোখে তুষার সরকার নামে এই ন্যাচারাল সিনটি আকন্দের আঠা হয়ে জড়িয়ে গেল। তুষার কথা বলছে দাঁড়িয়ে—আর তার ডান উরু একটু একটু দুলছে। চোখ কিন্তু শান্ত। তাকানো বেশ ঘন।

তপতী নিজের ভেতর থেকে টের পেল—তুষার সরকার সবসময় যেন কোন হান্ড্রেড মিটার রেসে আছে। বাঁশী বাজলেই চিতা হয়ে স্টার্ট নেবে। পা দুটো একদম পিস্টন। কথা বলতে বলতে একটু আধটু যে ঘাড় ঘোরাচ্ছে—তাতেই কলার বোন, চিবুকের হাড়, গালের এক দিককার ঝিক সবই একই সঙ্গে এক ঢেউয়ে জেগে উঠছে।

আপনি অ্যাথলেট ছিলেন নিশ্চয় ?

হান্ড্রেড মিটারে ইন্টার কলেজ দু'বার চ্যাম্পিয়ন—

এই যে বলেন—আপনি গ্র্যাজুয়েট নন্ ?

পাস করতে পারিনি। দু'বার বসেছিলাম। দু'বারই গাড্ডু। পারব কী করে বলুন ? টালিগঞ্জ অগ্রগামীকে তখন আমি ফার্স্ট ডিভিশনে নিয়ে গেছি কী করে—আমিই টপ স্কোরার—প্রথম বছর মহমেডান গোল খেল আমার পায়ে।

তুষার সরকার কথা বলে যাচ্ছে। তার কোন কথাই কানে যাচ্ছে না তপতীর।

সকাল আটটায় সে এসেছে রিসেপশনে। এখন চারটে বাজে। আর মাস দেড়েক বাদেই পুজো। বিকেলগুলো ছোট হবার চেষ্টায় আছে।

তপতী তুষারকে যতই দেখছে ততই তার মনে হচ্ছে—এখনও তো তুষারের কিছুই দেখা হয়নি আমার। না জানি আরও কত কী আছে তুষারের ওর সঙ্গে কথা বলতেও খুব ভাল লাগছে তপতীর।

সে পরিষ্কার জানতে চাইল, আচ্ছা তুষারবাবু—

বলুন—

আনন্দ হলেই আপনার নাচ আসে কেন? জগৎ সুদ্ধ আরও তো অনেকের আনন্দ হয়। আনন্দ আসে। তাদের তো নাচ আসে না।

দেখুন—আমি সব গুছিয়ে বলতে পারব না। আমি যা বলছি—তার থেকে আপনি মোদ্দা কথাটা বের করে নেবেন। তুষার যেন কাউকে ইণ্টারভিউ দিচ্ছে এমন গলায় বলল, জানেন, এ জন্যে আমার এই শরীরটাই-দায়ী। আহ্লাদ হলে—মন ভাল লাগলে—আনন্দের ভেতর আমার এই খেলাধুলো করা শরীরটা থির থির করে কেঁপে ওঠে। তারপর এই বডির ওপর আমার আর কোনও কণ্ট্রোল থাকে না। সে তখন নিজের ইচ্ছেমত সুর খুঁজে নিয়ে নাচতে থাকে। নাচতে শুরু করে দেয়। আমার মাসেলগুলো যেন পদ্মের পাপড়ির মতই খুলতে থাকে। সিনেমায় দেখেননি, ভালবাসার গানে পদ্ম আপনা আপনি পাপড়ি মেলে ধরে? ঠিক তেমনি।

তুষার সরকার কথা বলছে যেন—নিজের কথা নয়—কোনও একটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের গোড়ার দিককার সবগুলো বলে যাচ্ছে। তপতীও হায়ার সেকেণ্ডারির মেধাবী ছাত্রীর মতই কোনও মাস্টার মশায়ের কাছে জানতে চাইল, সে কোন্ সুর? কোথাকার সুর তুষারবাবু?

তা আমি জানি না। সে আমি বলতে পারব না।

কোন গানের সুর? কোন ইনস্ট্রুমেণ্টাল সুর?

আমি ডেফিনিটলি বলতে পারব না। তবে আই হ্যাভ এ হাণ্ড—বলেই তুষার একদম থেমে গেল।

বলুন না।

একটা গানকে আমি খুব চিনি। সে গানটা আমার ভেতর জানেন—হাসবেন না কিন্তু—মাঝে মাঝে ফুটে ওঠে—ঠিক ঘামের মত—গরমকালে যেমন আপনা আপনি ঘাম দেখা দেয়—ঠিক তেমনি।

তপতী দত্ত তুষার সরকারকে জানতে গিয়ে আস্তে আস্তে তার

ভেতরে ঢুকে যাচ্ছিল। যতই ঢুকছিল—ততই অবাক হচ্ছিল। তুষারের বুকের ভেতরকার দেওয়ালে নানা রকমের গাছপালা। তাতে হরেকরকমের ফুল। ফল। এ এক অজানা জগৎ। এরকম জগতের কথা তপতী কোনদিন শোনেনি। দেখেনি। শুরুতে তুষারকে মনে হয়েছিল—কুইয়ার—আশ্চর্য মানুষ। এখন দেখছে—এমনই একজন মানুষ—যে টানে—কিন্তু যার কোন থই পাওয়া যায় না—তার মানেও সে বোঝে না। এপার ওপার সীমানাও দেখা যায় না।

তপতী বলে বসল, সন্ধে হয়ে এল। চলুন না হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ি। বড্ড সাফোকেটিং লাগছে। ভেতরে শুধুই ফলস সিলিং। ফলস এলিভেশন।

কিন্তু আমি তো এখুনি বেরতে পারব না। যদি মিনিট কুড়ি ওয়েট করেন তো চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে আসতে পারি।

বেশ তো।

বিকেল সোয়া পাঁচটায় হলিডে-ইনের সামনে কলকাতা সন্ধেবেলার একটা মায়া তৈরি করল। সামনে মনোহরদাস তড়াগ কচুরিপানার বেগুনি ফুল আর সবুজ, নধর কচুরি পাতায় ভর ভরাট। তাদের সামনে দিয়ে তপতীকে নিয়ে তুষার ভরন্ত কলকাতায় হারিয়ে গেল।

ট্যাক্সিতে বসে তপতী বলল, কোথায় যাচ্ছি ?

ময়দান বা ভিক্টোরিয়ার মাঠ এত ঢাউস—চলুন আপনাকে আমার চেনা একটা ছোট্ট পার্কে নিয়ে যাব।

ছোট বলে ?

না না। সেজন্যে নয়। তার চারদিকে লোকালিটি। বাড়ি-আড়ালে সূর্য পড়ে যায় তাড়াতাড়ি। পার্কটার একটা সাবারবান কোয়ালিটি আছে।

কী রকম ?

যে-যার মত খেলে, দৌড়য়, বসে প্রাণায়াম করে, আবার গান গায় —কেউ কাউকে বিরক্ত করে না। পৌঁছতে পৌঁছতে সেখানে অন্ধকার নেমে পড়বে।

ট্যাক্সির ভেতরেই হলিডে-ইনে কাস্টমারকে যে-হাসি দেয় তাই হাসল তপতী। সে জানে এটা তার একটা ক্যাচার হাসি। কাস্টমার কাউন্টারে চাবি রেখে দিয়ে সারাদিন ঘুরতে বেরিয়ে এই হাসি একটু একটু করে মনে করবে। ভুলতে পারবে না।

তপতী লক্ষ্য করে দেখল—তুষার সরকার তার এই হাসির পর তার শান্ত চোখে এক সেকেন্ডের জন্যে তার মুখে তাকাল। কিন্তু তুষারের চোখের পলক একবারের জন্যেও পড়ল না।

খুব বিনীত গলায় তুষার বলল, আমি কিন্তু গাইতে পারি না।

তাহলে? তাহলে সুর তাল ঠিক রেখে নাচেন কী করে?

মনে মনে গানটা আমার শরীরের ভেতর দিয়ে বয়ে যায়। আর অমনি আমার দুই পা সেই গানের সুরটা তুলে নেয়। একদম আমার বুক থেকে।

পা তুলে নেয়? কী বলছেন? মানুষ তো গলায় গান তোলে।

তা হবে। কিন্তু আমার দুই পা সুরটা তুলে নেয়। আমি নাচতে থাকি পায়ের কথা শুনে। পা থেকে আমার দুই হাতও সুরটা চিনে নেয়। সর্দারজি। রোকিয়ে। আমরা এসে গেছি—

ট্যাক্সি থেকে নেমেই তপতী বলল, এ তো অয়্যারলেসের মোড়। তাই না? কাছেই কুদঘাট। এখানে একটা স্কুলে পড়িয়েছিলাম কিছুদিন।

তাই?

হ্যাঁ।

সামনেই অয়্যারলেস পার্ক। চারদিকে বাড়ি। মনে হবে পার্কটাই ছোটখাট একটা স্টেডিয়াম। চারপাশের বাড়ির দোতলা, তিনতলা থেকে গেরস্থ বাড়ির লোকজন বিকেলবেলা লোকাল টিমের ফুটবল খেলা দেখে। ওরাই আবার ভোরবেলা মর্নিং ওয়াকে মাঠে নেমে আসে।

এত মাঠ থাকতে এই পার্কটাই আপনার পছন্দ?

আমি খুব কাছেই থাকি। পুটিয়ারি যাবার সিমেন্ট বাঁধানো

পাকা ব্রিজের মুখে। চলুন—

কোথায় যাব ?

পার্কটা আপনার ভাল লাগবে।

তপতী গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখল—সত্যি অন্য রকম। দেশবন্ধু বা দেশপ্রিয় পার্কে আজকাল অনেকদিন হল আর বসা যায় না। রাস্তার কুকুর, নেশার লোকজন ঘোরে। নোংরা। সেই তুলনায় পার্কটা অনেক ছোট হলেও পরিষ্কার। তপতী বুঝল—চারিদিকে বাড়িঘর থাকায়—একদম ঘরোয়া লোকাল পার্ক এটা।

ক'দিন হল আর বৃষ্টি নেই। শুকনো মাঠ। তুষার বলল, বসি আসুন। বসে কথা বলতে সুবিধে লাগে।

বসেই তপতী খুব ভাবুক হয়ে পড়ল। কোত্থেকে হু হু করে তার ভেতর থেকে কবিতা উঠে আসতে লাগল। সে বুঝতেই পারছে না—কেন এখন কবিতা উঠে আসছে। এই ঢ্যাঙা লোকটা এমন করেই ভেতরকার কথা বলে! নাচে!! যার পা গানের সুর তুলে নিয়ে হাতে-বুকে সাপ্লাই দেয়।

কুচকাওয়াজের মাঠে নেমেছে সবুজ অন্ধকার।
মেমোরিয়ালের সাদা মার্বেলে চাঁদের আলো পড়েছে এখন
আবার তোমার সাথে দেখা হল

দাঁড়ানোর ভঙ্গি সেই একই—

তুষার জানতে চাইল, কার কবিতা ?

মনে নেই। কোথায় যেন পড়েছিলাম।

এই কবিতার সুর আমার পা তুলে নিতে পারবে না। বড় কঠিন সুর।

তপতী কোন কথা বলল না। এ মাঠেও সামান্য চাঁদের আলো পড়েছে। আশপাশের মানুষজন আবছামত দেখা যাচ্ছে। তুষার এখন দাঁড়ালে ভঙ্গিটা কি সেই একই হবে ?

যেন কোন চিতা, বাঁশি বাজালেই স্টার্ট নেবে।

তুষার বলল, আমি এতই গাঁড়ল জানেন—

তপতী খুব নরম করে বলল, ওভাবে কথা বলছেন কেন ? আমিই কি খুব বেশি জানি ?

তা নয়। সত্যি কথা বলা ভাল। যখন কলেজে ঢুকে সবাই কবিতা লেখে—কবিতা পড়ে—আমি তখন দুই পায়ে মাঠে বল নিয়ে দৌড়োচ্ছি। কাদামাখা জার্সি গায়ে যখন ক্লাবের টয়লেটে চান করছি—তখন আমার ক্লাসফ্রেণ্ডরা কবিতা পড়ত। আসলে আমার আই কিউ খুব লো। আমি কেন কবিতা বুঝি না বলুন তো ? ধরতে পারি না কেন ?

বেশ বোঝেন—বলে অন্ধকারে তুষারের মুখের দিকে তাকাল তপতী। নিজের ভাঁজ করা হাঁটুর ওপর দুই হাতের তাকে রেখে।

ভঙ্গিটা আধো অন্ধকার মাঠে স্বপ্নের একটা সিনের মতই তুষারের মাথায় গেঁথে গেল। সে কোন কথা বলতে পারল না। আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ।

যে-গানটাকে আপনি খুব চেনেন—সেটা একবার গান তো।

আমি কি গাইতে জানি! লজ্জা দিচ্ছেন। গান আমার ভেতরে ওয়ার্ক করে। তারপর তার সুরটা আমার পা তুলে নেয়। তখন আমি নাচি।

বেশ তো গুনগুন করেই গান। সুরটা শুনতে চাই আমি।

গাইব ?

এবার তপতী তুষারের ভাললাগা সেই হুকুমদারী গলায় বলে উঠল, হ্যাঁ। গাইবেনই তো। অ্যাথলেট-ফুটবলাররা এরকম করেন নাকি ? এত শাই আপনি ?

গুনগুন করে নয়—একদম তোড়ে গান বেরিয়ে এল তুষারের গলা দিয়ে। তপতী চমকে উঠল। আপনার তো রীতিমত ভাল গলা। আমায় এতক্ষণ মিথ্যে বলেছেন।

ঘচ্ করে গান থামিয়ে ফেলল তুষার সরকার। কলকাতার বাইরে চুঁচড়ো, গোবরডাঙায় ফুটবলের খেপ মারতে যেতাম ভাড়ায়।

লোকাল ট্রেনে। তখন সবাই মিলে গাইতে গিয়ে যা শিখেছি।

ভাড়ায় ফুটবল খেলতে গিয়ে শিখেছেন! হো হো করে হেসে উঠে তপতী বলল, ফুটবল খেলতে গিয়ে এত ভাল শিখেছেন—এমন ভরাট গলা। আপনি আমায় অবাক করলেন তুষারবাবু। নিয়মমত শিখলে না জানি আরও কত ভাল গাইতেন। নিন্—শুরু করুন।

দু'একটা রাস্তার ছেলে অন্ধকারে জুটে গেল। নয়ত শীতের আভাসেই অয়ারলেস পার্ক প্রায় ফাঁকা।

তুষার বলল, আমাকে এখানে সবাই চেনে।

নিশ্চয় পাড়ার হিরো আপনি?

না। তা নয়। ফুটবল খেলতাম তো একসময়। তাছাড়া রাত থাকতে এ-পার্কে এসে জগিং করি তো।

সে তো বডি দেখলেই বোঝা যায়। নিন্—শুরু করুন।

গানটা কিন্তু লোকগীতির মতই। বাংলাদেশের এক গায়িকার গলায় শুনেছিলাম রেডিওতে। শেফালি ঘোষ। শুনেই মুখস্থ হয়ে যায়—সব কথা বুঝতে পারবেন তো?

সেই হুকুমদারী গলা বেরিয়ে এল তপতীর। এ-গলা শুনলে স্থির থাকতে পারে না তুষার। তার ভেতরে যেসব শিরা দিয়ে রক্ত পাস করে—সেগুলোর ভেতর দিয়ে কে যেন মাঞ্জা দেওয়া ঘুড়ি ওড়ানোর সুতো আস্তে করে টেনে নিয়ে যায়। তাতে ঘষা লেগে কেটেও যায় ভেতরটা। আবার ভালও লাগে। অদ্ভুত এক চিরে যাওয়া ভাল লাগা।

খুব পারব। বাঙলা তো। নিন্ গান।

কত যে খুঁজেছি এই গানটা। যদি ক্যাসেটে পাওয়া যায়। এপারে আসেনি হয়ত।

উহুঁ। আর কথা নয়।

তোড়ে ভরাট গলা বেরিয়ে এল তুষারের মুখ দিয়ে—

যদি সুন্দর—র্

যদি সুন্দর—র্ একখান মুখ পাইতাম

চট্টগ্রামো পানো খিলি

তারে বনাই খাওয়াইতাম—

এরকম গান কি আপনার অত সুন্দর কবিতার পাশে দাঁড়াতে পারে? খুব লজ্জা দিলেন।

তুষার থেমে পড়ায় রীতিমত চেঁচিয়ে উঠল তপতী। কী হচ্ছে? লজ্জায় আপনি তো মেয়েদেরও হারিয়ে দিচ্ছেন।

যদি সুন্দর—র্

যদি সুন্দর একখান মুখ পাইতাম

চট্টগ্রামো পানো খিলি

তারে বনাই খাওয়াইতাম—

যদি সুন্দর—র্

যদি সুন্দর—র্ একখান মুখ পাইতাম—

তুষারের গমগমে গলার ভেতর তপতী ডুবে যেতে যেতেও ভীষণ এক লজ্জায় ভাঁজ করা হাঁটুর মাথায় দুই হাতের তাকে নিজের মাথাটি নামিয়ে রাখল। সেই লজ্জায় তার আনন্দও হতে লাগল। যদি সুন্দর—র্। যদি সুন্দর—র্ একখান—

তুষার তখন গাইছে—

রসের কতা রসেরো পিরীত

যদি জানে—এ

দু আন এক্ কান কইতাম তারে

প্র্যামেরো কারণে।

যদি সুন্দর—র্

যদি সুন্দর—র্ একখান মুখ পাইতাম—

নরনারী হওসে পিরীত

ও ভাই কী মজা তারে বুজাইতাম—

তুষার থামল। তপতী কোন কথা বলতে পারল না খানিকক্ষণ। এরকম গান সে কোনদিন শোনেনি। তার বড় হওয়া সদানন্দ রোডে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে খানিক হেঁটে গেলে পাতাল রেলের স্টেশন।

বাঁদিকে এগলে—একদম মুখোমুখি কালীঘাট পার্ক। ডানদিকে এগলে—সাদার্ন অ্যাভিনিউর শুরু। এরকম গান—এমন খোলাখুলি ভালবাসার কথা এত সুন্দর ভাষায় কখনও তপতী শোনেনি।

খুব শান্ত গলায় তপতী বলল, এ গানের সুর আপনি পায়ে তোলেন কী করে?

গানটা আমার ভেতর কী একটা হারানো জিনিস খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। আমি হন্যে হয়ে খুঁজি মনে মনে। তখন গানটা আমার বুক থেকে ডাউনওয়ার্ডস্ পায়ে নেমে যায়। সুর হয়ে।

হাসলেন!

এ কি বাতের ব্যথা যে পায়ে নেমে যায়! গান থাকে গলায়।

আপনি অ্যাথলেট ছিলেন—ফুটবলার ছিলেন বলেই গান সুর হয়ে পায়ে নেমে যাবে?

যায় কিন্তু। বিশ্বাস করুন। তখন এক রকমের আনন্দ হয়। তাতে নাচ এসে যায়।

চুপ করুন।

সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের ভেতর খুব কাছাকাছি একদম হাড়গুঁড়নো গলায় একটা কুকুর দমকে ধমকে উঠল তপতীকে। ঘেউ ঘেউ। গরর-র-র—

বাবা গো—! বলে তপতী পাশে বসা তুষারের গায়ে গিয়ে পড়ল। দু'হাতে তুষারের পিঠ জড়িয়ে ধরল।

ভয় পাবেন না। ভয় পাবেন না। এই সোনালি—কী হচ্ছে?

তপতী তখনও তুষারের গায়ে। দেখতে পেল, অন্ধকার ফুঁড়ে একটা বেশ বড় কুকুর—সোনালি ঘেঁষা লোমে ঢাকা—তুষারের মুখের কাছে মুখ এনে জিভ ঝুলিয়ে দাঁড়াল। সমানে হ্যাঃ! হ্যাঃ—করে চলেছে।

আমার কুকুর। সারাদিন দ্যাখেনি তো। আমার গলা পেয়েই ছুটে এসে অন্ধকারে চুপটি করে বসে গান শুনছিল।

তপতী সরে বসে আঁচলটা ঠিক করল। ছাড়া থাকে ?

না। সেই তো ভাবছি। দরজা খুলে বেরিয়ে এল কী করে ?

এদিককার রাস্তাঘাট তো বিশেষ চেনে না। রোজ ভোরে অবশ্য দৌড়তে আসার সময় ওকে সঙ্গে করে আনি। ওরও ডেইলি কিছুটা দৌড়নো দরকার।

আগে ও এরকম কখনও বেরিয়ে এসেছে একা একা ?

কখনও না। হয়ত আমার স্ত্রী ফেব্রিকের কাজ নিয়ে বেরিয়েছে বিকেলে। দরজা টেনে দেবার আগেই পেছন থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়েছে। মহুয়া দেখতে পায়নি—বা খেয়ালই করেনি। কুকুর তো। ওরা কোন শব্দ না করেই চলাফেরা করে।

সোনালি তখনও লম্বা জিভ ঝুলিয়ে দিয়ে হ্যাঃ! হ্যাঃ! করে চলেছে। তুষার তার গলায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, কিন্তু শিখা তো বাড়ি থাকে। হয়ত তখনও স্কুল থেকে ফেরেনি। সেই ফাঁকে—

তপতী কোনও কথা না বলে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। তারপর হন হন করে পার্কের দিকে হাঁটতে লাগল। কিন্তু গেট দিয়ে বেরতে গিয়েই একটা শিকে বিঁধে পেছনে টান লাগল তপতীর। অন্ধকার পার্ক। গোড়ায় মনে হয়েছিল, কেউ বুঝি তাকে পেছন থেকে টানল। পেছন ফিরে দেখে, খানিক দূরে সোনালিকে নিয়ে তুষার এদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার আঁচলের একটা কোণ গেটের শিকের মাথায় লোহার ফলায় বিঁধে আছে। তপতী আলগোছে আঁচলটা ছাড়িয়ে নিতে হাত বাড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেল তপতীর। আজ সে হলিডে-ইনে যায়নি। কমপেনসেটরি লিভ পাওনা ছিল। জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখা যাচ্ছে। বর্ষা শেষের কলকাতার বিকেল। সেই দিনটাও সেই বিকেলটাও—ঠিক এমনি ছিল। মাথার ওপর ফুল স্পিডে পাখা ঘুরছে। স্কুল থেকে সোমাকে নিয়ে ফিরে মা-মেয়েতে একসঙ্গে শুয়ে ছিল। কতদিন সেখানে গিয়ে ঘুমনো হয় না। অন্যদিন এই সময়

তপতী হলিডে-ইনের রিসেপশনে থাকে।

তপতী উঠে বসল বিছানায়। যা ঘটেছিল সেদিন বিকেলে—স্বপ্নটা প্রায় তার অবিকল ভিডিও ফিল্ম। আশ্চর্য। অনেক কথাই ভুলে গিয়েছিলাম। ফের মনে পড়ে গেল। এ কথাগুলো মনে মনে নিজেকে বলে তপতীর স্পষ্ট মনে পড়ল—আমি সেদিন তুষারের মুখে ওর বউ-মেয়ের নাম শুনে অমন সুন্দর গান শুনেও রাগে জ্বলে উঠেছিলাম।

হন হন করে বেরিয়ে আসার সময় সত্যিই আঁচলটা গেটে অমন আটকে গিয়েছিল।

তপতী আস্তে সোমার পিঠে হাত রাখল। দেখল, মেয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। মহুয়া, শিখা—সব কথা জেনেশুনেই তো আমি তুষারের সঙ্গে বিয়েতে বসেছিলাম।

তের

তুমি আর কবে ডিভোর্স নেবে?

এই তো। এবারই এই পুজোর পর।

গতবছরও তা-ই বলেছিলে তুষার।

মহুয়া যদি দিতে না চায় তো জোর করব নাকি?

হ্যাঁ। জোর করবে। তার ও-বাড়িতে থাকার কী দরকার। বলো তাকে শিখাকে নিয়ে আলাদা বাড়িতে থাকুক। তুমি আমি দু'জনে মিলে সে-বাড়ির সব খরচ চালাব।

সন্ধেবেলার কলকাতার রাস্তা। বেশ শীত পড়েছে। তপতীর সঙ্গে পাশাপাশি হাঁটছে তুষার প্রায় ঘণ্টাখানেক। হলিডে-ইন থেকে বেরিয়ে দু'জনে ময়দান পেছনে ফেলে এখন হরিশ মুখার্জি রোডে। একটু আগে এস এস কে এম হাসপাতাল গেল।

আমি জোর করি কী করে? কী জোর করব? বলব, চলে যাও? তা হয় কখনও? মহুয়া, আমি, তুমি, শিখা—আমরা সবাই

মিলে কাছাকাছি তো থাকতে পারি! শিখা আমার মেয়ে। তাকে বলব, তোমার মায়ের সঙ্গে চলে যাও? তোমাকে ভালবাসি বলে মহুয়াকে বের করে দেব? বাঃ! মহুয়ার জন্যেও আমি চিন্তা করি। সে আমার এত দিনকার বউ। তোমাকে ভীষণ চাই—না দেখে পারি না তপতী। তোমায় আমি ভালবাসি তপতী। কিন্তু তার মানে এই নয় যে—মহুয়াকে আমি ভালবাসি না। মহুয়াকে আমি আমার অল্প বয়সে বিয়ে করেছিলাম। তখন আমরা দু'জন দু'জনকে খুব ভালবাসতাম। এ কথা তো মিথ্যে নয়। আজ আর সেই ভালবাসা পাই না। এখন তোমাকে ভীষণ চাই। ওঃ! আমি যে কোন পথ পাচ্ছি না। এমন একটা রাস্তা—যে রাস্তায় তপতী তুমি আছ। আবার মহুয়াও আছে।

এরকম হাজারটা কথা তুষারের মনের ভেতর দিয়ে এক একটা গ্রেনেড হয়ে পর পর ফাটতে লাগল। একটার ধোঁয়ার ভেতর আরেকটা ফাটল। পর পর। তখন তুষারের সামনে দিয়ে—পাশ দিয়ে কলকাতার রাস্তায় লোকজন হেঁটে যাচ্ছে। অ্যামবাসাডর, ফিয়াট, মারুতির দল ফিক ফিক করে হেসে চলে যাচ্ছে তাকে দেখে। তার পাশে তখন তপতী।

কী? কোনও কথা বলছ না কেন? আমি কি এভাবেই সারা-জীবন তোমার রক্ষিতা হয়ে থেকে যাব?

ছিঃ! তপতী। নিজেকে রক্ষিতা ভেবে ছোট হয়ে যেও না! আমি তোমাকে—স্বামী যেভাবে ভালবাসে—সে ভাবেই ভালবাসি। আমি তোমার স্বামী। তুমি আমার স্ত্রী। শুধু আইনের জন্যেই ব্যাপারটা আটকে আছে।

বাজে কথা বোলো না। সারা কলকাতা জানে—আমি তুষার সরকারের রক্ষিতা। সারা হলিডে-ইন আমাকে তোমার কেপ্ট বলে। কে বলেছে? নাম বলো।

কেউ কি আমার সামনে বলে? আমার আড়ালেই বলে!

তুমি নিজে শুনেছ? নিজের কানে শুনেছ? হুঁ

না। আমার কানে এসেছে।

চলো তপতী। আজ আমরা একজন উকিলের কাছে যাই।

ওঃ! তুমি আজও কোন উকিলের সঙ্গে কনসাল্ট করনি, কনসাল্ট করে উঠতে পারনি? এতদিন তা হলে কী করেছ?

না। আগে তো কখন এমন সিচুয়েশন আসেনি আমার জীবনে—

এ সিচুয়েশন তো তোমারই ক্রিয়েশন তুষার।

শুধুই আমার? তোমারও নয় কি? যাক গিয়ে, ঝগড়া করে কোন লাভ নেই। এ রাস্তায় অনেক দুঁদে উকিল থাকে। চলো। এগিয়ে দেখি।

মিত্র মেইন পেরিয়ে বাঁ হাতে একটা তিনতলা বাড়ির লম্বা একতলার সবটা দেখা যায় রাস্তা দিয়ে। পরপর তিনখানা ঘরের দরজা হাট করে খোলা। একেবারে শেষের ঘরে বড় টেবিল ল্যাম্প জেবলে তার আলোয় ঝুঁকে পড়ে গোঁফওয়ালা একজন মোটা লোক চশমা নামিয়ে কী পড়ছেন। তাঁকে ঘিরে সব দেওয়াল মোটা মোটা বাঁধানো বইতে ভর্তি। ঢুকতেই পয়লা ঘরে বেঞ্চ, চেয়ার—সবই ভর্তি। নানা চেহারার লোক বসে।

চলো যাই।

তপতী তুষারের পেছন পেছন ঢুকল। ঘরে ঢুকে ওরা এবার দেখতে পেল—উকিলের মত দেখতে দুঁদে চেহারার লোকটির দু'পাশে দু'জন দু'জন করে দুই সেট মক্কেলই হবে—তারা বসে। দু'পাশ থেকেই তারা গোঁফওয়ালা লোকটির মুখে তাকিয়ে। তিনি যদি কিছু বলেন।

তুষারকে পথ আটকাল একজন ধুতি-পাঞ্জাবি। এখন ঢুকবেন না। স্যার এখন আরবিট্রেশনে আছেন। আপনারা বসুন—

তুষার বুঝল, উকিলবাবু এখন দু-পক্ষকে ডেকে নিজের টেবিলে বসে কোর্টের বাইরে একটা নিষ্পত্তি করে দেবার চেষ্টায় আছেন। এখন কি আর তিনি তুষারদের কথা শুনবেন? তুষারের ভরসা— তার নিজের হাইট। মক্কেলদের সঙ্গে বসে সে উটপাখির মত বারবার

তার ঢ্যাঙা গলা-মাথা তুলে তুলে উকিলবাবুকে দেখতে লাগল।

তপতী তার পাশে বসে। সে তুষারের ঊরুতে বড় করে একটা চিমটি কাটল। করছ কী ?

দ্যাখোই না—আমার মত ঢ্যাঙা তো বড় একটা এখানে আসে না। ঠিক চোখে পড়ব।

তুষারের কথা ফলে গেল। উকিল ভদ্রলোকের কপালে বোধহয় একটা চোখ আছে। তিনি গম্ভীর গলায় ডাকলেন, আসুন—

তখনও তুষারের বিশ্বাস হয়নি। সে বলল, আমি ? আসব ?

হ্যাঁ। আপনি। আসুন—

তুষার তপতীর হাত ধরে বলল, চলো।

উঠে দাঁড়িয়ে সবার সামনে নিজের হাত তুষারের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তপতী তুষারকে ফলো করল।

উকিল তপতীকে দেখে বললেন, আপনি ?

তুষার বলল, আমার সঙ্গে এসেছেন।

উকিল ভারি গলায় হেসে বললেন, তা বুঝেছি। তবু আমরা বাজিয়ে নিয়ে থাকি। চলুন পাশের ঘরে যাই—

পাশের ঘরটা রাস্তা থেকে চোখে পড়ে না। ছোট মত। বইয়ে দেওয়াল ঠাসা। গদিমোড়া বড় বড় সোফা। উকিলবাবু বসে বললেন, বলুন—

আমরা বিয়ে করতে চাই। কিন্তু আমি বিবাহিত।

কী নাম ?

তুষার সরকার।

ওনার নাম ?

তপতী নিজেই বলল, তপতী দত্ত।

আপনি আগে কখনও বিয়ে করেছেন ?

উকিলের এ কথায় তপতীর খুব অস্বস্তি হল। সে নরমাল মুখে বলল, না। আগেই তো উনি বলে দিলেন।

তপতীর এ কথায় উকিলের মুখে কোন ছায়া পড়ল না। ঘাট

হবেন। মাথাটি আধাআধি পাকা। গোঁফও তাই। তিনি বললেন, তবু আমরা রিচেক করি। তা তুষারবাবু—আপনারা দু'জনই হিন্দু ?

বললাম তো আমাদের নাম।

উঁহু। তা নয়। আপনার স্ত্রীর কথা জানতে চাইছি।

হ্যাঁ। সেও হিন্দু। একথা জানতে চাইলেন কেন ?

আমার কাছে যখন এসেছেন—তখন সব কথার উত্তর পাবেন। —বলে উকিলবাবু খুব ঘনিষ্ঠ গলায় বললেন, ধরুন আপনি যদি অন্য ধর্মের মেয়ে বিয়ে করে থাকতেন—আর তিনি যদি আপনার সঙ্গে বিয়ের সময় তাঁর ধর্মটি বজায় রাখতেন—তা হলে সিচুয়েশন বদলে যেতে পারত। আমাদের সব দিক ভেবে স্ট্র্যাটেজি নিতে হয় মিস্টার সরকার। বলছেন, আপনার স্ত্রীও বিয়ের আগে থেকেই হিন্দু ছিলেন—

ছিলেনই তো। এখনও আছেন।

না, যদি তিনি মুসলমান বা খ্রিস্টান হতেন—আর যদি বন্ধ্যা বা পাগল হতেন—বা ইনকিউরেবল্ ডিজিজে ক্রমাগত ভুগতেন—

এসব কথাই আসছে না। শী ইজ কোয়াইট হেল অ্যান্ড হার্টি।

তুষারের এ কথায় তপতী তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

তাহলে তো ভালই। আপনি ডিভোর্স নিন। নিয়ে মিস দত্তকে বিয়ে করুন।

অত সহজ হলে কি আপনার কাছে আসতুম ? তুষার মরিয়া গলায় চেঁচিয়ে উঠল, আমার বউ কিছুতেই ডিভোর্স দিচ্ছে না।

উকিলবাবু চাপা গলায় বললেন, আস্তে। পাশেই আরবিট্রেশনের মক্কেলরা বসে।

তুষার বলল, এই সিচুয়েশনে কী করব ?

সিধে আলিপুরে গিয়ে দু'জনে নাম পালটে এফিডেভিট করে কোন সম্পাদককে ধরুন।

সম্পাদক ? নাম পালটে ?

হ্যাঁ। এই চব্বিশ পরগনা বার্তা কিংবা আলিপুর সমাচার—এরকম কোন কাগজে এফিডেভিটের পর নতুন নাম দুটি দিয়ে ছোট্ট করে একটি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেবেন।

বিজ্ঞাপন?

হ্যাঁ। আগে এজলাসে দিয়ে হুজুরের সামনে এই বলে এফিডেভিট করবেন—অদ্য হইতে আমি তুষার সরকার—পিতা ডট ডট ডট—নিবাস ডট ডট ডট—ওসমান খাঁ হইলাম।—বলে উকিলবাবু তপতীর মুখের দিকে হেসে তাকালেন। তারপর বললেন, প্রেমের কামড় বড় কামড়! আপনি বলবেন, আমি তপতী দত্ত—ডট ডট ডট—ডট ডট ডট—আয়েসা খাতুন হইলাম। তারপর তো বলেই দিলাম—আলিপুর সমাচার কিংবা চব্বিশ পরগনা বার্তায়—কিংবা আরও অনেক কাগজ আছে—সেখানে পয়সা দিয়ে টেণ্ডারের বিজ্ঞাপনের মাঝে ছোট্ট করে বিজ্ঞাপন দেবেন—যাতে কারও চোখে না পড়ে—আবার আপনাদের কাজও হয়ে গেল?

এফিডেভিট?

করাননি কখনও। বেশ তো কাল সকাল দশটায় জজকোর্টে চব্বিশ নম্বরে চলে আসবেন। আমি বসি ঠিক অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জজের এজলাস বাড়ির মুখোমুখি। ব্রিটিশ আমলের পুরনো একটা হরিতকি গাছ আছে দেখবেন—তার ছায়ায় টালির চালায় আমার মুহুরি বসে—সেখানেই পাবেন আমাকে—চালার নিচে বাঁ দিকে প্রথম তক্তপোশে—

এসব করলেই হয়ে যাবে?

হ্যাঁ তারপর অ্যাডভার্টাইজমেণ্টটা দেবেন। সম্পাদকরা কাছাকাছিই থাকেন—দেখিয়ে দেব।

বিজ্ঞাপন দিলেই হয়ে যাবে?

তুষার কথা বলছে আর তপতী দেখল, সে এই ঠাণ্ডাতেও ঘেমে উঠেছে। উকিলবাবুর কথায় কী এক অপমান তার সারা মুখে লেগে গিয়ে চট চট করছে। ভালবেসে শেষে এতগুলো বিচ্ছিরি দরজা পেরতে হয়?

উকিলবাবু বললেন, নাঃ! তা কী করে হয়? বিজ্ঞাপন ছাপা হবার পর ওসমান খাঁ আয়েসা খাতুনকে সঙ্গে নিয়ে কোন মসজিদে ইমাম সাহেবের কাছে যাবেন। তাঁকে বিজ্ঞাপনটি দেখাবেন। তখন ইমাম সাহেব কলমা পড়িয়ে ওসমান খাঁয়ের সঙ্গে আয়েসা খাতুনের নিকে দিয়ে দেবেন। ব্যাস! হয়ে গেল। তখন ওসমান খাঁয়ের দুই বেগম! আগেরটি তো আছেনই। আর নয়া বেগম আয়েসা খাতুন।

আর একটুও না বসে তপতী উঠে দাঁড়াল। চলি—বলেই তপতী বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। তুষার উকিলবাবুর সঙ্গে পাকা অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করতে পারল না। তপতীকে ধরতে তাকেও উঠতে হল। বলা ভাল —ছুটতে হল তুষারকে।

ওই দূরে আবছা মত তপতী। জোরে হেঁটে চলেছে। এ রাস্তায় আলো যেটুকু গেরস্থ বাড়ির জানলা দিয়েই আসছে। আর আকাশের চাঁদ তেমন জোরালো নয়। স্ট্রিট লাইট সব নিভে আছে।

তপতীকে ধরার জন্য ছুটতে ছুটতে তুষার বিড় বিড় করে বলল, উকিলও জুটল এমন—যার রসিকতার চোটে তপতী রেগে খাপ্পা। নয়ত সিধে উঠে অমন বেরিয়ে যায়! অবশ্য উকিলবাবু মিথ্যে কিছু বলেননি। ওসমান খাঁ হয়ে আয়েসাকে বিয়ে করলে মহুয়া তো সেই স্ত্রীই থেকে গেল। উকিলবাবুর ভাষায় পয়লা বেগম।

চোদ্দ

একদা জঙ্গল হাসিল করে কলকাতা হয়েছিল। সেসব ইতিহাসের ব্যাপার। কিন্তু কলকাতায় প্রায়-জঙ্গল আজও যে আছে তা না দেখলে বিশ্বাস হবে না। কলকাতা থেকে দক্ষিণে সিধে হেঁটে গেলে তো জঙ্গল পাওয়া যাবেই। বঙ্গোপসাগরের পাড়ে। বসতি ফুরিয়ে গেলেই জঙ্গলের শুরু। কিন্তু কলকাতা এগিয়ে যেতে যেতে দু'এক জায়গায় প্রায় বনজঙ্গলের মতই গাছপালা ফেলে গেছে। সেগুলো প্রায় পকেট জঙ্গল।

এরকম দেখা যায় শহরতলির রেলস্টেশনের দু'ধারের বসতির পেছনে। যেখানে লোকালয় নেই। আর এখন এই শীতের দুপুরে দেখা যাচ্ছে।—সমর স্যারের টিউটোরিয়াল থেকে আদি গঙ্গার গা ধরে উত্তরে আধ মাইলটাক এগিয়ে। পেছনে কুদঘাট। বাঁয়ে হরিদেবপুর। কবরডাঙা। সামনে উজিয়ে গেলে বেহালাকে পাওয়া যাবে।

টিউটোরিয়ালের সব স্টুডেন্টকে নিয়ে এই সময়টায় সমর স্যার বনভোজন করে থাকেন। এখানটায় কী গাছ নেই? হরিতকি থেকে সবেদা। সেই সঙ্গে তাদের গা বেয়ে উঠে পড়া ফুলেল কিছু লতা। পায়ের নিচে খসেপড়া শুকনো সব পাতা একদম মুচমুচে। জামরুল গাছের মাথায় অসম্ভব তৃপ্ত গলায় এক কাক-ফ্যামিলি গল্প করছে। তাদের গলার আওয়াজ এই ছায়ায় ভিজে গিয়ে ভারি কিন্তু খুব মিষ্টি লাগছে শিখার কানে। সে হাঁড়ির ভেতর একখানা হাতা পাঠিয়ে এক পিস মাংস আর ঝোল তুলে ডাকল, এই পল্টু। একটু টেস্ট করতো—

ভাড়া করা রান্নার ঠাকুর দু'জন এখানে পঁচিশ-ছাব্বিশটি ছেলে-মেয়ের ভেতর এই দিদিমণিটির কথায় সবচেয়ে বশ হয়ে গেছে অল্পক্ষণে। তারা শিখাকে কিছু বলল না। শুকনো পাতার ওপর পেতে দেওয়া ডেকরেটরের শতরঞ্জিতে কেউই বিশেষ বসছে না। একটা বেতের চেয়ার পেতে বসে কাগজ পড়তে পড়তে সমর স্যার মাঝে মাঝেই হাঁক দিচ্ছেন—সাপখোপ থাকতে পারে—যেখানে সেখানে পা দিও না কেউ। অকারণে বিপদ ডেকে এনো না।

পল্টু খসে পড়া একটা নারকেলের ডেগোকে ঠাকুরদের দা চেয়ে নিয়ে কেটে কুটে হকি স্টিক বানাবার চেষ্টা করছে অনেকক্ষণ ধরে। মাংস টেস্ট করে দেখার জন্যে শিখার ডাক শুনতে পেয়েও সে সাড়া দিল না। ডেগোটা প্রায় হকি স্টিক হয়ে এল। এখন একটা বল পেলেই হয়। যতদূর দেখা যায়, গাছের পর গাছ। গাছতলার ভেতর দিয়ে একটা এলোমেলো মাঠ এখানে পড়ে আছে।

সমর স্যার সকালের কাগজ পড়তে পড়তেই যেন নিজেকে শুনিয়ে বললেন, নবাবদের বাগান ছিল একসময়। বলেই আবার তিনি কাগজ

পড়তে লাগলেন। পড়তে পড়তে তাঁর মনে পড়ল, বি এ-তে আমার হিস্ট্রি ছিল।

সমর স্যার অবশ্য কী কায়দায় বি এসসি-ও পাস করেন একবার। তাঁর সময়ে নাকি একটি ডিগ্রি চেপে গিয়ে আরেকটা ডিগ্রি পরীক্ষায় বসা যেত। অবশ্য ইন্টারমিডিয়েটে সায়েন্স ছিল সমর স্যারের। এসব গল্প ফি বছর টিউটোরিয়ালের স্টুডেন্টরা স্যারের মুখ থেকে শুনে থাকে। তাই তারা গর্ব করে বলে থাকে—স্যার ডবল গ্র্যাজুয়েট। ট্রিপিল এম. এ.। ভয়ংকর জ্ঞানী।

শিখা আবারও ডাকল, এই পল্টু। একটু টেস্ট করে যা—

এবার পল্টু মাথা তুলে তাকাল। আমার ভাল নাম অশোক।

ওই হল। অশোক। খেয়ে দেখ তো মাংস সেদ্ধ হল কিনা?

এই ডাকে অশোক শিখার একদম কাছে চলে এল। কিন্তু খেল না।

কী হল?

গোড়ায় এত ভাল ব্যবহার করছ। শেষে খারাপ বিহেবিয়ার করবে না তো?

একজন ঠাকুর কাছাকাছি বসে বেগুনির বেগুন সাইজ মত কাটছিল বঁটিতে। সে এমন একটি তাগড়া ছেলের এই মিনমিনে ভাব দেখে কিছু অবাক হল। শেষে ভাবল, পড়াশুনো করতে এসে ভদ্দরলোকের ছেলেরা হয়ত এমন হয়ে থাকে। কিন্তু দিদিমণিটি তো বেশ ডাকাবুকো। সালোয়ার কামিজে গাছপালার ফাঁক দিয়ে নকশা হয়ে রোদ এসে পড়ায় শিখাকে অন্যদিনের চেয়ে আরও তুখোড় লাগছে।

তা তো বলতে পারছি না এখনই। খেয়ে দ্যাখ তো।

আবার তুমি তুই তুই করছ আমাকে।

আচ্ছা হয়েছে। খেয়ে দ্যাখো দয়া করে।

এবার পল্টু হাতাটা শিখার হাত থেকে নিজের বাঁ হাতে নিয়ে ডান হাতে গরম মাংসের পিসটা তুলে মুখে দিল।

শিখা তার মুখের দিকে তাকিয়ে। বেগুন কাটা থামিয়ে ঠাকুরও পল্টুর মুখে তাকিয়ে।

পল্টু কচমচ করে মাংসের পিসটা চিবিয়ে খেয়ে ফেলল। ফার্স্ট ক্লাস।

শিখা বলল, নিশ্চয় তোর মুখে তরুণাস্থি পড়েছে। শব্দ হল অমন।

পল্টু অবাক হয়ে বলল, তরুণাস্থি ? সে কী জিনিস ?

হাইজিন-বই-টই কোনদিন পড়িসনি ! নরম, কচকচে হাড় হলেই বুঝতে হবে তরুণাস্থি। শক্ত হাড় হলে অমন সহজে খেয়ে ফেলতে পারতিস না।

পল্টু কাচমাচু মুখে বলল, আমি তো কেনোদিনই পড়াশুনো করিনি।

খুব হয়েছে। এবার ঝোলটা টেস্ট করে দ্যাখ তো।

হাতাটা ঠাকুরের পিঁড়ির ওপর সাবধানে নামিয়ে রেখে দিয়ে পল্টু বলল, আবার তুমি আমাকে তুই তুই করছ।

ঝোলসুদ্ধু হাতাটি পিঁড়ির ওপর রাখা বাটা মশল্লার কাঠের বাটির গায়ে ঠেসান দিয়ে রেখেছিল পল্টু। সেটা তুলে নিয়ে শিখা নিজেই ঝোলটা চুমুক দিয়ে খেয়ে বলল, চমৎকার। গন্ধটাও ভাল হয়েছে ঠাকুরমশাই।

এবার হাতাটা নামিয়ে রেখে গোঁজ খেয়ে দাঁড়ানো পল্টুকে শিখা বলল, তুই। তুই। একশ বার তোকে তুই বলব। ওনাকে শেষে না আপনি বলতে হয় !

সমর স্যার আজকাল-কাগজের চিঠিপত্র পড়ছিলেন। নানা ধরনের চিঠি ছাপে আজকাল। পড়তে পড়তে কাগজের আড়ালে তার মুখে একটা হাসি এসে গেল। কেউ দেখতে পেল না। শিখা আর পল্টুর সব কথা তিনি শুনতে পাচ্ছেন।

গরম ঝোলটা খেয়ে খুব ভাল লাগছে শিখার। এতক্ষণ কালো সোয়েডের পাম্পশুর ভেতর তার পায়ে শীত শীত করছিল। এখন

আর তা লাগছে না। গরম গরম মাংসের ঝোলই আলাদা জিনিস।

একা একা গাছতলা দিয়ে মাটির ওপর ভেজা আর শুকনো পাতা মাড়িয়ে হাঁটতে বেশ লাগছে শিখার। আরও এগিয়ে একটা বটতলা। মাথার ওপর অন্তত শ'খানেক পাখির একটানা কিচিরমিচির। নিচে আধ-খাওয়া লাল টুকটুকে বটফলে ঘাস ঢাকা পড়ে গেছে। এখানটায় শীতের রোদের সঙ্গে ছায়া ফিফটি ফিফটি। এর বাইরে যেন আর পৃথিবী নেই। শিখা দাঁড়িয়ে পড়ল। অন্যরা সবাই যে-যার মত বেরিয়ে পড়েছে। ছোট ছোট দল বেঁধে। একবার এখানে এলে সাধ হবেই—দেখিই না এর শেষটা কোথায় ?

শিখা তার ডানদিকে তাকিয়ে দেখতে পেল—গাছপালার আড়ালে আড়ালে কয়েকটা কালো মাথা, একটা টাকা, একটা ঘোমটা শূন্য দিয়ে যেন ভেসে যাচ্ছে। ফিক করে হেসে ফেলল শিখা। একা একা। আসলে আদি গঙ্গাটা অনেক নিচে। এখন বোধহয় বড় গঙ্গার জোয়ারের জল এখানে এল। নৌকোর পাটাতনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যারা চলেছে—তাদের শুধুই মাথাগুলো দেখা যায়।

হঠাৎ শিখার কাছাকাছি পল্টুর গলা শোনা গেল ! একা একা এতদূর এসেছ—সাপখোপ আছে কিন্তু।

বুড়োদের মত কথা বলবি তো মারব এক গাঁট্টা। সাপখোপ থাকল তো তুই আছিস কী করতে ? সাপ বেরোলেই হাতের ডেগোটা দিয়ে মারবি কষে—

শিখার এ কথায় পল্টুর মনেই থাকল না—এই মাত্র শিখা আবার তাকে তুই তুই করে কথা বলেছে। বরং তার ভাল লাগল এই ভেবে —সাপ বেরলে শিখা তাকে মারবার ভার দিয়েছে। যেন এইসব গাছতলা শিখারই একার। এখন কিছু ঘটলে শিখাকে বাঁচাবার ভার তার ওপর।

একটা নতুন জায়গা দেখলে সেটা খুঁজে খুঁজে দেখতে ইচ্ছে করে না পল্টু ?

এ আবার নতুন কোথায় ? এখানে তো আমরা আসি। কয়েক

বছর আগেও এখানে ফাঁদ পেতে একটা বেজি ধরেছিলাম।

এ বাগানের সবটা তো আর জানিস না। কত বড়। কত দূর গেছে—

এটা তো বাগান নয়। গাছপালায় ভর্তি বিশাল এক মাঠ—প্রায় জঙ্গল। সামনের দিকে হেঁটে গেলে ক্যাওড়া পুকুর, সোদপুর পড়বে। তার পেছনেই ঠাকুরপুকুর—বেহালা। অবশ্য আদি গঙ্গা পেরিয়ে।

এই দেখিস! কোন সাপটাপ যেন আমায় না কামড়াতে পারে। আগে আগে পাহারা দিয়ে চল।

পল্টু এগিয়ে গিয়ে শিখার আগে আগে হাঁটতে লাগল। হাতের ডেগোটা দিয়ে যা সামনে পড়ছে, যাচাই করে দেখছে পল্টু। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, আমায় তুমি—তুমি বলতে পার না?

সে দেখা যাবেখন। এখন তো আমরা এই জঙ্গলটা আবিষ্কার করে দেখি। কী বলিস—

কখনও এতক্ষণ ধরে পল্টু শিখার সঙ্গে সঙ্গে থাকেনি। একদম পাশাপাশি। কাছেপিঠে আর কেউ নেই। যদিও অন্যদের কথা, গানের কলি—গাছপালার ভেতর দিয়ে শোনা যাছে। পাখিদের কিচির-মিচিরের সঙ্গে। এমনকি গাছতলায় রাঁধতে চাপানো মাংসের গন্ধও বুঝি বাতাসে।

পল্টু মনে মনে নিজেকে বলল, শিখা তো আসলে ঢ্যাঙা তুষারের মেয়ে। ছোটবেলা থেকেই তার বাবার সঙ্গে শিখা দৌড়োয় পার্কে—ঢ্যাঙা হুইসেল দিয়ে অনেক দিন আগে হাতের স্টপওয়াচে তাকিয়ে থাকত—আর ছোট শিখা তখন পার্কে পাক খেত দৌড়ে দৌড়ে—এসব দেখা পল্টুদের। এরকম মেয়ে না হলে কি কেউ কলকাতার ভেতর জঙ্গল আবিষ্কার করতে বেরোয়? ওই তো আদি গঙ্গার ওপারে করুণাময়ী যাবার রাস্তায় লাইটপোস্ট দেখা যাচ্ছে গাছপালার ফাঁক দিয়ে।

এমন শান্ত, ছড়ানো গাছতলা বড় একটা দেখা যায় না। পল্টু

ডেগো দিয়ে আগে আগে ঝোপঝাড়ের মাথায় বাড়ি দিয়ে দেখেছ, কোন সাপটাপ বেরোয় কিনা। কিছুই না। একবার একটা কাঠবিড়ালী তাড়া খেয়ে দিব্যি একটা কাঁঠাল গাছ বেয়ে ওপরে উঠে গেল। মাথার ওপর পাখিদের কোন বিশ্রাম নেই।

পল্টু আর শিখা আচমকাই একটা ভাঙা বাড়ির সামনে এসে পড়ল। ছাদ নেই। ধসে পড়া দেওয়াল। মেঝেটেঝে লতায় পাতায় ঢাকা। ছোট ছোট ইট।

শিখা বলল, একসময় এখানে লোক থাকত।

কে আর থাকবে এই জঙ্গলে!

তখন হয়ত পরিষ্কার বাগানই ছিল। এখন তা জঙ্গল। ওই দ্যাখ একটা গেট।

ঠিক গেট নয়। বাড়ির শুরুতে উঁচু করে গাঁথা দরজা মত। তবে অনেক চওড়া। শিখার মনে হল—হয়ত প্রাচীনকালে এভাবেই গেট তৈরি হত। তার মন জানতে চাইল, কত প্রাচীন? কত হাজার বছর আগের?

পল্টু ডেগোটা দিয়ে গেটের গায়ের লতাপাতা সরিয়ে দিতেই একখানা সাদা পাথর বেরিয়ে পড়ল। তাতে পরিষ্কার কালো হরফে খোদাই করে ইংরেজিতে লেখা—

প্রিন্স গুলাম মহম্মদ

ক্যালকাটা

১৮৯০

হরফের কালো কিয়েক জায়গা উঠে গেছে। সমর স্যারের মুখে শিখা শুনেছে,

টিপু সুলতানের নাতিদের একসময় সারা টালিগঞ্জে ইংরেজরা ছড়িয়ে ছড়িয়ে বন্দী করে রেখেছিল। প্রিন্স গুলাম মহম্মদ সেরকমই কোন নাতি হবেন। একটু আগে আবিষ্কারের গন্ধ পেয়ে এই ভাঙা গেট, ধসে পড়া বাড়িকে শিখার মনে হয়েছিল—প্রাচীন কালের। ১৮৯০ মানে মাত্র শ'খানেক বছর আগের। হাসি পেল শিখার। সঙ্গে

সঙ্গে প্রিন্স গুলাম মহম্মদের জন্যে তার মনটা ভারি হয়ে গেল। গাছপালার ভেতরে এই বাড়িটায় তাঁকে রাখা হয়েছিল। হয়ত তিনিই এখানে অনেক গাছ লাগিয়েছিলেন। এই বাগানেই তিনি ঘুরে বেড়াতেন।

পল্টু বলল, ফিরে চলো। আমাদের খুঁজছে হয়ত। খেতে ডাকছে—

চল। খিদে পায়নি তোর?

তোমার?

আমার তো খিদেয় পেট চুঁই-চুঁই করছে। আরেকদিন তুই আর আমি এখানে আসব। সবটা ঘুরে ঘুরে দেখব।

শিখাকে নিয়ে সে একা এখানে এসেছে আরেকদিন—এ কথা ভাবতেই পল্টুর ভীষণ ভাল লাগল। সে জানতে চাইল, গল্‌ফ ক্লাবের ওখান থেকে আসতে কষ্ট হয় না তোমার? এতটা পথ।

কষ্ট কিসের? ট্রাম ডিপো থেকে অটোতে চলে আসি।

তোমার বাবা আর ছোট মাকে মাঝে মাঝে অয়ারলেস পার্কে দেখি।

শিখা দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, আমার কোন ছোট মা নেই। তুই যাকে দেখিস, সে আমার বাবার নতুন বউ। বলেই শিখা অন্যমনস্ক গলায় বলল, সব ভালবাসা একদিন ফিকে হয়ে যায় কেন বল তো?

পল্টু কখন এরকম কোশ্চেনের মুখোমুখি হয়নি। সে কিছুই বলতে না পেরে দাঁড়িয়ে গেল। তার হাতে নারকেলের ডেগো। মাথার ওপর গাছের ডালে পাখিদের আলাদা করে দেখা যায় না। তারা কিচিরমিচির করেই চলেছে।

পনের

কলকাতার এত কাছে—কাছে কেন, কলকাতার ভেতরেই এমন যে খোলামেলা জায়গা আছে, না এলে তুষার বা তপতী কারুরই জানা হত না।

গত পরশু সারাটা শীতের দুপুর তপতীকে নিয়ে তুষারের কেটেছে আলিপুর আদালত চত্বরে। কালো কোট, টাইপরাইটারের খটাখট খটাখট, বিরাট বই, গাছতলায় চ্যাটাইবেড়ায় ঘেরা খাবারের দোকান, হ্যান্ডকাপ পরানো আসামীর পেছন পেছন পুলিস, সারা কোর্ট এলাকা যেন ওদের দিকে তাকিয়ে। তা-ই মনে হচ্ছিল তপতীর। নথিপত্র ঠাসা ঝুলপড়া ছোট্ট একটা ঘর থেকে এফিডেভিটের কপি নিতে হল।

কপি নিয়ে টালির চালের নিচে সেই উকিলের সেরেস্তায় যেতেই তিনি বললেন, বসুন বসুন। অনেকক্ষণ ধরে ঘোরাঘুরি করতে হচ্ছে আপনাদের।

তুষার এই উকিলকে বেশি কথা বলাতে চায় না। এতই রসিক, যেকথাই বলেন তিনি, সবই যেন তপতীর গায়ে ছ্যাঁকা দেয়। তুষার বলল, এবার তো অনুবাদ করিয়ে নিতে হবে কপিটা—

না, অত বড় কপির ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড অনুবাদ করলে তা ছাপতে সে তো আলিপুর সমাচারের পুরো এক কলম লেগে যাবে। আমাদের দেখতে হবে, কাজও হয়ে গেল, আবার খরচাও খুব বেশি একটা হল না। তাই না?

তুষার কোন কথা বলল না। সে এই ক'দিন উকিলের কাছে যাতায়াত করে বুঝতে পেরেছে—বারবার 'আমাদের' 'আমাদের' বলে উকিল তাকে কনফিডেন্স দিচ্ছে—আর উকিলের ওপর তুষার যাতে নির্ভর করতে পারে সেরকম একটা অ্যাটমোসফেয়ার তৈরি করছে।

খরচার কথায় মনে মনে হেসে ফেলল তুষার। উকিলের কাছে ক'বারের যাতায়াতে কম বেরোয়নি।

উকিল বলল, আমি আগেই সেটা একটা অনুবাদ করে রেখেছি। এই নিন—

কাপজখানায় কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং হাতে লেখা এফিডেভিটের বাংলা বয়ান। তুষার বলল, আগেই এ কাগজখানা দিলেন না কেন? তাহলে ছাপতে দিয়ে দিতাম!

উকিল একগাল হেসে বলল, এফিডেভিটের কাগজ না দেখে কোন কাগজই আপনার এই বাংলা-মুসাবিদা ছাপত না। মসজিদে যে যাবেন—সেখানেও ইমাম সাহেব আপনাদের কলমা পড়ানোর আগে এফিডেভিট দেখতে চাইবে। এফিডেভিটখানা আপনাদের বিবাহিত জীবনের গ্যারাণ্টি বলতে পারেন। সাবধানে আলমারিতে রেখে দেবেন—

আদালত চত্বরের বাইরে এসে তপতীর প্রথমেই মনে হল ঃ আবার পৃথিবীতে ফিরে এলাম। উঃ!

চেতলা পার্কের পেছনে আলিপুর সমাচারের অফিস কাম প্রেস। যেতেই সম্পাদক তো লুফে নিল তুষার আর তপতীকে। বসুন বসুন।

সিগারেট প্যাকেটের মত ছোট্ট ঘর। পাশেই ট্রেডল মেশিনের ঘটাং ঘটাং। থামার নাম নেই। বসার চেয়ার মোটে দু'খানি। দু'খানিই ফোল্ডিং। বসতে হল খুব সাবধানে। তুষার দেখল হাতঘড়িতে, পৌনে দুটো। পাশেই ময়রার দোকান থেকে সকালে ভাজা শীতের প্রথম ফুলকপির সিঙাড়ার গন্ধ আসছে।

সম্পাদক পঞ্চাশের ও-পারে। কাঁচাপাকা মাথা। ঢোলা পাঞ্জাবি, চোখে বেশি পাওয়ারের কাচ মনে হল। কাগজখানা হাতে নিয়ে বললেন, এ তো ম্যারেজ ম্যাটার্স। এর রেট তো আলাদা। অর্ডিনারির চেয়ে টোয়েণ্টি পারসেণ্ট বেশি।

এফিডেভিটে তো বিয়ের কোন কথা নেই।

আমরা বুঝি স্যার! বিয়ের ব্যাপার না হলে জোড়ে কেউ নাম বদলায়! আটত্রিশটা ওয়ার্ড আছে। দু'ইঞ্চি জায়গা লাগবে। চুরাশিটা টাকা দিন—

তাই?

হ্যাঁ। পাঁচ সি এম খাবে বিজ্ঞাপনটা। সি এম সতের টাকা করে। চার সি এম ছাড়ালে একটাকা ডিসকাউণ্ট। হেডিং থাকলে আরও এক সি এম জায়গা নিত।

হেডিং ?

হ্যাঁ। খবরের হেডিং থাকে না ? এ ধরনের বিজ্ঞাপনে অবিশ্যি কোন হেডিং থাকে না। কেউ তো আর জানাজানি হোক চায় না—! কী বলেন ?

কোন জবাব না দিয়ে গুণে গুণে চুরাশি টাকা এগিয়ে দিল তুষার।

টাকাটা নিয়ে সম্পাদক নিজেই বলল, চারদিকে টেণ্ডারে বিজ্ঞাপনের ভেতর আপনাদেরটা ছেপে দেব। কেউ দেখতেও পাবে না।

ভীষণ অপমান লাগল তপতীর। সে বলে বসল, কেউ দেখতে পাবে না ?

হ্যাঁ। আপনারা দেখলেন। আর মসজিদের ইমাম সাহেবকে দেখালেন। তা হলেই তো চুকে গেল। আলিপুর সমাচার কিন্তু শনিবার বিকেলে ছেপে বেরোয়। উইকলি তো। শনিবার সন্ধেবেলা এলেই তিন কপি কাগজ ফ্রি পেয়ে যাবেন।

তুষার জানতে চাইল, তিন কপি কেন ?

বাঃ! বুঝলেন না ? এক কপি আপনি রাখবেন। এক কপি আপনার মিসেস রাখবেন। রেকর্ডসের জন্যে।

আরেক কপি ?

বেশ কুণ্ঠিত হয়ে হাসল সম্পাদক। ধরুন যদি উকিলের কাছে যেতে হয় আবার—তার জন্যে থার্ড কপিখানি।

আবার উকিলের কাছে যাব কেন ?

যেতেই যে হবে তার কোন মানে নেই। কিন্তু ধরুন যদি আপনাদের কোন মনোমালিন্য হল—কথার কথা বলছি! ডিভোর্স নেবার কোশ্চেন এসে গেল—তখনকার জন্যে ওই থার্ড কপিখানা আমরা ক্লায়েণ্টকে দিয়ে থাকি। বুঝলেন—অনেক ভেবেচিন্তেই—ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমরা এই পলিসি নিয়েছি। ধরুন আজ থেকে দশ বছর পরে এ কাগজ আপনি পাবেন কোথায় ? আমার কাছে এলেও পাবেন না। তখন উকিলকে কী দেবেন ?

এসব শুনতে দু'জনের কারোরই ভাল লাগছিল না। পয়সা দিয়ে বিজ্ঞাপন দেব, অথচ চাইব না জানাজানি হোক,—এ কেমন চুরি করে বিয়ে করা!—মনে হল তপতীর। শীতের দুপুরে গলির ভেতরে ফেরিওয়ালার গলাও অলস। আমাদের কোন ক্ষমতা নেই? সবটাই ভীষণ অপমানের মনে হচ্ছে তপতীর। তারপর সম্পাদক যখন বলল, ডিভোর্স নেবার কোশ্চেন এসে গেলে আলিপুর সমাচারের থার্ড কপিটা উকিলের জন্য লাগবে—তখন মনে হল এই পানসে, অপমানে ভরা বিয়ের জন্যে এত ঝামেলা? টাকা, উকিল, এফিডেভিট, অনুবাদ, বিজ্ঞাপন, ইমাম, মসজিদ?

তুষারের ট্রাউজারের সাইড পকেটে এখন আলিপুর সমাচারে ছাপা সেই বিজ্ঞাপন। বুক পকেটে এফিডেভিট। পাশে তপতী। ডিসেম্বরের বেলা দশটা। টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপো থেকে গড়িয়া যেতে বাঁশদ্রোণির পরের স্টপে ঊষা কোম্পানির বিরাট এক সাইনবোর্ড। মিনি থেকে নেমে দু'জনে রিকশায় বসলে চোখের সামনে আদিগঙ্গার ওপর চওড়া কাঠের পুল ভেসে উঠল। উলটোদিক থেকে টাটকা ফুলকপির পাহাড় ভ্যানরিকশায় করে বাজারে চলেছে।

লালচে কার্ডিগানের বোতাম আটকে তপতী কানের পাশাপাশি কলার তুলে দিল। আমার জন্যে তোমায় অনেক হয়রান হতে হচ্ছে। তাই না?

তুষার বলল, এ তো তোমার একার নয়। হয়রানি কেন মনে করতে যাব।

তুষার—

উঁ।

তুমি সেই সাত সকালে বিয়ে করে বসলে কেন বলো তো?

আমি কি জানতাম—জীবনের এই জায়গাটায় এসে তোমার সঙ্গে দেখা হবে, তপতী?

তপতী তার পাশে তুষারকে শীতের ঝকঝকে রোদে চোখ ভরে না দেখে থাকতে পারল না। মাথায় ক্রু কাট ছাঁট। লম্বা লম্বা

কাম। চওড়া কাঁধে সাদা পুলওভার সই সই। ব্রিজ পেরনোর পর সুন্দর সুন্দর বাড়ি। আবার, মাটির দেওয়ালের ওপর টিনের চাল। জায়গাটা শহর হয়ে উঠছে। রিকশার চাকা বাম্প করল। তপতী দেখল, তুষারের শান্ত চোখ যেন দম বন্ধ করে অদৃশ্য বাতাস দেখছে।

তুমি বেশ কবিতা করে কথা বলতে পার তুষার।

কবিতা? আমার ভেতরে কোথায় কবিতা দেখলে?

ওই যে বললে—জীবনের এই জায়গাটায়—

ওঃ। এ আর এমন কী কথা! আচ্ছা ভাই—

রিকশাওয়ালা চালাতে চালাতে বলল, বলুন—

বন্দেআলি পল্লির মসজিদের কাছাকাছি যাব।

বললেন তো সামনে বাজার। তারপরেই বাদামতলায়—

ওহ, বলেছি বুঝি।—বলে চুপ করে গেল তুষার।

শহর শহর চেহারা এবার গাছপালার ভেতর হারিয়ে যেতে লাগল। মাটির ঘর। টিনের চাল। কিন্তু ইলেকট্রিক খুঁটি। টালির ঘর। সি এম ডি এর জলের ট্যাংক আকাশমুখো।

তপতী চাপা গলায় বলল, তুমি টেনশনে ভুগছ তুষার। এখন থেকে আমি আর তুষার সরকার নই। আমি ওসমান খাঁ। ভুলে যাও তুমি তপতী দত্ত। এখন থেকে তুমি আয়েসা।

ও হ্যাঁ। তাই তো। কিন্তু হলিডে-ইনে?

সেখানে আমি আর তুমি—তুষার আর তপতী। কে খোঁজ নিচ্ছে! গাবিয়ে না বেড়ালেই হল।

একদিকে কচুবন, কাঁচা ড্রেন, খুঁটোয় বাঁধা গরু ঘাস খাচ্ছে। আরেক দিকে টিনের চালের গা দিয়ে টি ভি-র অ্যান্টেনা, রেডিও মেরামতির দোকান থেকে গান—মাঝখানে ডাঙা পিচ রাস্তায় হালের পোশাকে ছেলে-ছোকরাদের পাশাপাশি খালি-গা মানুষজন মোটা চাদর জড়িয়ে খালি পায়ে যাতায়াত করছে। দেখতে দেখতে বন্দেআলি পল্লি এসে গেল। সেটা বোঝা গেল, একটা কাপড়ের দোকানের সাইনবোর্ড থেকে।

রিকশা থেকে নেমে হাঁটতে হাঁটতে তুষার আর তপতী রাস্তার দু'পাশে বসা সকালের বাজার দেখতে দেখতে এগিয়ে চলল। তুষারের সবকিছুই নতুন লাগছে। শ্রীকৃষ্ণ সুইটস। সর্ষের ঘানি। লেপ-তোশকের দোকান। 'সাধারণের তাড়িখানা।' তারপরেই গড়িয়ার দিক থেকে আসা রাস্তার সঙ্গে ক্রসিঙের মাথা ঢেকে বিশাল এক বাদাম গাছ। নিচে অনেক দোকানপাট।

এবার দু'জনেই সাদা চুনকাম-করা একটি মসজিদ দেখতে পেল। কাছে এসে দেখল, দেড়তলা বাড়িটার গায়ে লেখা—স্থাপিত ১৩০১। সে তো একশ বছর। তখন এখানে মানুষজন ছিল?

তুষারের গলা পেয়ে তপতী চমকে উঠল। কী বললে?

স্থাপিত ১৩০১। তখন এখানে মানুষজন ছিল?

তপতী বলল, আমার তো মনে হয়—কালই এ-জায়গাটা সবে তৈরি হয়েছে।

তপতী কথা বলছে আর তার দিকে তাকিয়ে থাকা তুষার চোখ ঘোরাতে পারছে না। কলার তুলে দেওয়া কার্ডিগানের তোড়ায় তপতীর মুখখানি একটি ফুল যেন।

ঠিক এইসময় একজন মাঝবয়সী লোক এগিয়ে এসে বলল, আপনারা কাউকে খুঁজছেন?

ইমাম সাহেবের সঙ্গে দেখা করব।

আমি ইমাম সাহেব। বলুন।

তুষার আর তপতী ভাল করে দেখল। সাদা লুঙ্গির ওপর ঢোলা পাঞ্জাবি। চিবুকে কাঁচাপাকা দাড়ি। চোখে চশমা।

তুষার বলল, আমরা বিয়ে করব।

নিকে? ৭০

হ্যাঁ।

মনে হচ্ছে তো হিন্দু!

হ্যাঁ।

এফিডেভিট করেছেন?

হ্যাঁ। আমি ওসমান খাঁ।

উনি?

আয়েসা হয়েছেন—

তপতী যত শুনছে ততই যেন গুটিয়ে যাচ্ছে। যেন-বা নাম ভাঁড়িয়ে নকল বিয়েই করতে চলেছে, মনে হচ্ছে তার। কোথায় একটা অপমান সারাটা বিয়ের গায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে।

ইমাম সাহেব বলল, কাগজে অ্যাডভার্টাইজ করেছেন তো।

হ্যাঁ। সব করেছি।

সঙ্গে এনেছেন?

দেখান দেখি—

তুষার বলল, কোথাও বসে যদি—

কোথায় আর বসাব আপনাদের। খানিক আগে নামাজ পড়ে গেলেন সবাই। এখন এখানেই দেখান না—

তুষার তপতীর মুখে তাকাল। রাস্তা দিয়ে রিকশা, সাইকেলে যারা যাচ্ছে, তারা যেন—তুষারের মনে হল, তপতীকে দেখে হাসতে হাসতে যাচ্ছে। তপতী ঘাড় নামিয়ে লজ্জায় রাস্তার দিকে তাকিয়ে।

বিজ্ঞাপনটা আলিপুর সমাচারের পাতা থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ল ইমাম সাহেব। তারপর মুখ তুলে বলল, ঠিক জায়গামত ছেপেছে। কারও চোখে পড়বে না।

একথায় তপতীর লজ্জা যেন দ্বিগুণ হয়ে গেল। সে পায়ের কাছে রাস্তা থেকে চোখ সরিয়ে বাদামতলার পেছনে শীতের শুকিয়ে আসা একটা ডোবায় রাখল। সেখানে জল কমে এসেছে। কয়েকটা ল্যাংটা ছেলে একদিকে বাঁধ দিয়ে বড় বড় দুই টিন দিয়ে সমানে জল ছেঁচে চলেছে। যত জল কম আসছে—ততই বন্দী মাছগুলো এদিক ওদিক লাফ দিচ্ছে। ঝাঁপ দিচ্ছে। ঘাই মারছে। দু'একটা ধরাও পড়ছে। নিজেকে তপতীর মনে হল—সে যে ওই ডোবারই মত পৃথিবীতে বন্দী। চারদিকে বাতাস শুষে নিয়ে তাকে ধরার ফাঁদ যেন ছোট হয়ে আসছে। এবার তার গলায় টান পড়বে।

তপতী একবার তুষারের মুখের দিকে তাকাল। এই শীতের সকাল-বেলায় সেই শান্ত চোখে ইমাম সাহেবের মুখে তাকিয়ে তুষার রাস্তায় দাঁড়িয়ে। ইমাম সাহেব মসজিদের বাইরে বাঁধানো দলিজে বসে। তুষারকে দেখে হঠাৎ তপতীর মনে হল—কোন চিতা দুই পায়ে ভর করে দাঁড়ানো। সুযোগ পেলেই এবার সে ঝাঁপিয়ে পড়বে। সরু টান টান কোমর। নিচের দুই পায়ের দু'দিকে অদৃশ্য ডানা লাগানো। দরকার হলে তুষার উড়ে গিয়েও ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

ইমাম সাহেবকে তুষার একবার বলল, সব নিয়ে কী রকম পড়বে?

সে দেখা যাবে। আপনাদের নিকের মত আমাদের বিয়েতে অত লাগে না। ইচ্ছে হলে—সে আপনি লাখ টাকা ওড়াতে পারেন। নইলে কী খরচা!

তবু?

সে দেখা যাবেখন। কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা।—বলে থেমে গেল ইমাম সাহেব।

তপতীর একটু আগে হাসি এসে গিয়েছিল। ইমাম সাহেবের মুখে নিকে আর বিয়ে কথা দুটো ঠিক উলটো পালটা জায়গায় বসে গেছে। এবার সে বুঝতে পারছে—ইমাম সাহেব নতুন কোন ফ্যাকড়া তুলবে।

তুষার আর থাকতে পারল না। বলুন?

অস্থির হবেন না। আমায় ভাবতে দিন।

ইমাম সাহেব ভাবছেন। সারা বন্দেআলি পল্লি স্তব্ধ হয়ে ভাবছে। বাদামতলায় বিশাল কাঠবাদাম গাছটা চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবছে। সব পৃথিবী যেন ভাবছে।

হঠাৎ ইমাম সাহেব প্রায় চেঁচিয়ে বলে উঠল, তিনজন সাক্ষী। সে জোগাড় হয়ে যাবে।

ষোল

মহাত্মা গান্ধী রোড বর্ষার জলে থই থই। তার ভেতর ট্রামলাইনের নিচে ঝামাপাথর ইট ক'খানা খুলে রেখেছে। এখন স্যাণ্ডেলের স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেলেই চিত্তির। এই বৃষ্টি আসে। আবার চলে যায়। দোকান পেরিয়ে মহুয়া বাঁ দিকে সোনাপট্টি রোডে ঢুকল। ঘিঞ্জি। ওরই ভেতর তেলেভাজার কড়াই। তার নিচে হিস হিস করছে কেরোসিনের ডবল সিলিণ্ডার স্টোভ। দূরে আকাশের ভেতর সাবেক হাওড়া ব্রিজের খাঁচাটা ধোঁয়াটে।

জগনুলাল ভীমভাইয়ের শাড়ির কারবার। মাঝারি থান এনে মহুয়ার মত মেয়েদের দিয়ে ফেব্রিকের কাজ করিয়ে নেয়। এসব শাড়ি বেশির ভাগই চলে যায় রাজস্থানি, গুজরাটি খদ্দেরদের ঘরে।

বৃষ্টির ছাঁট বাঁচিয়ে দোকানে ঢুকতেই মহুয়ার দিকে তাকিয়ে জগনুলালের পার্টনার ভীমভাই তাকে গদিতে বসতে বলল, বহিনজি, একদম ভিজে গেছেন। একটু বসুন।

মহুয়া বসল। খদ্দেরকে কাপড় দেখাচ্ছে ভীমভাই। তারই বয়সী হবে—একজন গুজরাটি মহিলা স্বামীর সঙ্গে শাড়ি কিনতে এসেছেন। বউটিকে কোন্ শাড়িতে সবচেয়ে মানাবে—তাই ঠিক করতে পারছে না তার স্বামী। একটার পর একটা শাড়ি দেখে চলেছে ছেলেটি। আর পছন্দ হয়ে যেতে পারে এমন শাড়ি থাক দিয়ে আলাদা করে একপাশে রাখছে।

মহুয়ার নিজের মনে হল—আমার জীবনে এরকম হল না কেন? আমাকে এমন ভালবাসবে সে—আমাকে সাজিয়ে দেখার জন্যে ফুল আনবে, শাড়ির পর শাড়ি আনবে—নানান সুগন্ধী আনবে—তার ভালবাসায় আমি সুখে ডুবে যাব। সেই ভালবাসায় আমার সবসময় মনে হবে—শুধু আমার জন্যেই এইমাত্র চারদিক আলো, রঙে হেসে উঠল।

কারও কারও জীবন এমনটি কখনই হয় না। আমি সেই দলের। অন্য কোন্ মেয়ে সেজে সুন্দরী হবে—তাকে ভাল দেখাবে বলে—আমি ঘাড় নিচু করে চোখের বারোটা বাজিয়ে দিনের পর দিন ফোঁরকের কাজ করে চলেছি। গল্ফ ক্লাবের গায়ে বাড়ি থেকে বড়বাজারে সোনাপট্টিতে জগনুলাল ভীমভাইয়ের এই দোকান কম রাস্তা নয়। এসপ্ল্যানেডে নেমে বত্রিশ নম্বর ধরে মহুয়া। বাসগুলোয় আগে থেকেই বাজারি লোকজন তাদের বস্তা নিয়ে বসে থাকে। কোন কোনদিন বাসে পেঁয়াজের গন্ধ। কোনওদিন তামাকের। যেদিন যেমন প্যাসেঞ্জার। তারপর মহাত্মা গান্ধী রোডের ক্রসিঙে নেমে হেঁটে আসা ঝামা ইটের ওপর ট্রামলাইন দেখে মহুয়ার সব সময় মনে হয়—এই বুঝি আমার পায়ের ওপর দিয়ে ট্রাম চলে যাবে। সে রকম কোন ব্যাপার নেই। কিন্তু বড়বাজারের কাছে এই ট্রামলাইন দেখলেই তার মন বলে ওঠে—আমি একদিন লাইন পার হচ্ছি—হঠাৎ ট্রাম এসে আমার পায়ের ওপর দিয়ে চলে গেল।

খদ্দের নিয়ে ভীমভাই ডুবে আছেন। এখন মহুয়ার কাজ বুঝে নেওয়ার সময় তাঁর নেই। বড়বাজার এলাকায় সংসারের খুঁটিনাটি সবই কিনতে পাওয়া যায়। মুখের ঢাকনা হারিয়ে গিয়ে একটা কেটলি খোঁড়া হয়ে আছে অনেকদিন। এ দিকে খুঁজলে নিশ্চয় আলাদা করে কিনতে পাওয়া যাবে। মহুয়া বলল, ভাইসাহেব, আমার কাজগুলো থাকল। আমি একটু ঘুরে আসি।

শখসে বহিনজি—বলে ভীমভাই আবার খদ্দেরকে শাড়ি মেলে মেলে দেখাতে লেগে গেল। সোনাপট্টির রাস্তা সবসময় লোকে, ঠেলাতে গিজগিজ করছে। এদিকে কত যে জিনিস কেনার মত আছে তার ইয়ত্তা নেই। যেটাই দেখে সেটাই কেনার ইচ্ছে হয় মহুয়ার। সঞ্জয়ের জন্যে একটা ছাতা কিনতে কিনতেও কেনা হল না। মনে পড়ল, সবচেয়ে আগে শিখা যাতে চেয়ারে বসে পড়তে পারে—খাটে বসে টেবিল টেনে নিয়ে পড়তে বসে বসে ঘাড়ে ব্যথা হয়েছে—সে জন্যে একটা হালকা প্লাস্টিকের চেয়ার কেনা দরকার।

এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে মহুয়া আবার ট্রামলাইনে এসে পড়েছে। অনেকদিন পরে পানবাহার দেওয়া এক খিলি পান খেল মহুয়া। বাড়ির কাছে কোন পানের দোকান নেই। রোজ রাতে খাবার পর একটা পান খেতে ইচ্ছে হয়। একদিন সঞ্জয় অনেকটা হেঁটে বড় রাস্তার দোকান থেকে পান এনে দিয়েছিল। হঠাৎ পানের দোকানের আয়নায় দুটো চোখের ছায়া সরে গেল।

মহুয়া সঙ্গে সঙ্গে সরে এল। ক'দিনই সে লক্ষ্য করছে, যখনই সে এ পাড়ায় কাজ দিতে আসে জগলাল ভীমভাইয়ের দোকানে—কে যেন তাকে ফলো করে। সারা শরীরে একটা অজানা ভয় ঝিলিক দিয়ে চারিয়ে গেল।

কত রকমের লোক যে আছে রাস্তাঘাটে। মহুয়া একটা ঠেলার ডগা এড়িয়ে ফুটপাথ থেকে নেমেই আবার ফুটপাথে উঠতে যাবে—এমন সময় একদম মুখোমুখি পড়ে গেল লোকটার।

ওঃ! তুমি? অফিসে না গিয়ে এখানে?

সঞ্জয় আমতা আমতা করে বলল, এদিকে এসেছিলাম—

এদিকে? কেন? তোমার তো এখন আগরপাড়ায় থাকার কথা।

একটা কাজে পাঠাল অফিস থেকে—

উঁহুঃ, এদিকে তো কোন কাজ থাকতে পারে না তোমার। বুঝেছি।

রাস্তার ভেতরেই সঞ্জয় খুব কাছে এগিয়ে এল। শোনো, শোনো মহুয়া—

ছিঃ! তোমার লজ্জা করে না?

সঞ্জয় কিছু বলতে পারল না। হাত দিয়ে মহুয়ার হাত ধরার চেষ্টা করল।

মহুয়া সরে গেল। এখন বুঝেছি—একজন কে বড়বাজারে এলেই আমাকে দূর থেকে ফলো করে। কাছাকাছি এসে সরে যায়। ফিরে তাকালে ভিড়ের আড়ালে চলে যায়—পাছে আমি চিনে ফেলি।

শোনো। শোনো মহুয়া—

না। আমি আর কিছুই শুনব না সঞ্জয়।

আমার কথাটা শোনো।—এর বেশি বলতে পারল না সঞ্জয়।

তুমি আমায় ফলো কর কেন? আমি তোমার স্ত্রী।

সঞ্জয়ের কান্না এসে যাচ্ছিল। রাস্তায় ভিড়। আবার গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টির ছাঁট। সে কোনরকমে বলতে পারল, তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে—

বাজে কথা বোলো না। এটা একটা কোন কথা হল? আমাকে গোপনে ফলো করছ—

শোনোই না আমার কথাটা।

আমি কিছুই শুনব না। চললাম—বলে মহুয়া জগুলাল ভীমভাইয়ের দোকানে চলল।

এবার সঞ্জয় জোর কদমে হেঁটে খোলা রাস্তায়—ভিড়ের ভেতর মহুয়ার সামনে গিয়ে একদম তার রাস্তা আটকে দাঁড়াল। চশমার কাচে বৃষ্টির ছাঁট। মোছা দরকার। মহুয়ার মুখখানাই যেন ঝাপসা হয়ে গেল। তুমি এত সুন্দর—আমার বিশ্বাসই হয় না—তুমি আমার স্ত্রী।

তাই—? বলে থমকে দাঁড়াল মহুয়া।

হ্যাঁ মহুয়া। তাই আমার ভয় করে—তুমি এখন একলা কাজ দিতে আস এদিকে—আমি ভাবি, যদি তুমি অন্য কাউকে ভালবেসে ফেল।

সে জন্যে আমার পেছনে পেছনে লুকিয়ে ফলো কর! ছিঃ! ভুলে যেও না—আমার স্বামী তোমার হাতে আমাকে তুলে দিয়েছে।

চোখ ছলছল করে উঠল সঞ্জয়ের। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে তার চশমার ফাঁক দিয়ে এখন সে মহুয়ার এত কাছে দাঁড়িয়েও দূরের আলোর মতই তার মুখখানির আভাস পাচ্ছে মাত্র। সে-মুখ এখন ধারালো—কঠিন পাথর।

তুষারদা আর তোমার স্বামী নয় মহুয়া। তোমার স্বামী এখন আমি।—বলেও সঞ্জয় বুঝল সে কিছুই খুলে বলতে পারেনি। সে বলতে চাইছিল, এখন আমিই তোমার স্বামী। আমায় ভালবাসো

মহুয়া। তোমাকে আমার খুব দামি জিনিস মনে হয়।

মহুয়া সিধে সঞ্জয়ের মুখে তাকাল। আবার খোঁচা খোঁচা দাড়িতে মুখ ঢেকে গেছে। শার্টের কলারে ঘেরা গলাটা সরু। তাতে কণ্ঠমণি জেগে। আজ কেন জানি সঞ্জয়কে সিধে আঘাত করতে ভীষণ ভাল লাগছে মহুয়ার। সে এই ভিড়ের রাস্তায়—লোকজন, ট্রামের চাকার ঘসটানো শব্দের ভেতর কেটে কেটে বলল, তুমি আমার স্বামী—তা যদি আমি মানি, শুধু তখনই তুমি আমার স্বামী। নইলে নয়।

সঞ্জয়ের গলা বুজে এল, সে কোনরকমে বলতে পারল, তুষারদা তোমার স্বামী নয়। সে তোমাকে ভালবাসে না।

আরও ব্যথা দিতে সামান্য হেসে মহুয়া বলল, সে আমি বুঝব। বলেও মহুয়ার মনের ভেতরে খা খা শূন্য একটা জায়গা সে যেন এইমাত্র টের পেল, তুষার আর তার স্বামী নয়। তুষার আর তাকে ভালবাসে না। আর একথা জানতে পেরেই কি এক পালটা আঘাত দিতে মহুয়ার ভীষণ ভাল লাগতে লাগল। সে বলল, তোর কী আছে যে তোকে ভালবাসতে যাব ?

আমি তোমার স্বামী। আমি তোমাকে ভালবাসি।

স্বামী! হুঃ! ভুলে যাসনে—তুষারকে আমি ডিভোর্স দিইনি।

সঞ্জয়ের ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। সে এখন চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু তুষায়দা তো তপতীকে বিয়ে করেছে।

যাকে ইচ্ছে বিয়ে করুক। আমি তো ডিভোর্স দিইনি।

একটু দয়া করো মহুয়া। তুমি এত কঠিন—

আমি মানলে তবে তুই আমার স্বামী। আমাদের বিয়েটা তো বিয়েই নয়।

একথা বোলো না মহুয়া। তুমি আমার—একথা ভাবলেই আমার আনন্দ হয়।

জগুলাল ভীমভাইয়ের দোকানে যাবে বলে মহুয়া বাঁ হাতে সোনাপট্টিতে ঢোকার মুখে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, ছিলি তো বাড়ির

দালাল। শুতিস হাসপাতালের বেঞ্চে—তোকে তুলে এনে আমার স্বামী করা হয়েছে—এ কথা ভুলে যাসনে।

সঞ্জয় দেখতে পেল, ভিড়ের ভেতর মহুয়া মিশে যাচ্ছে। তখনও মহুয়াকে তার ভীষণ সুন্দরী লাগল। সে নিজেই একদিন মহুয়াকে বলেছিল, সে মহুয়াকে পাবার আগে কলকাতার কোথায় কোথায় ঘুমবার জায়গা করে নিত।

সতের

কুদঘাট সিমেণ্ট ব্রিজের মুখে দোতলা ক্রিম রঙের বাড়িটার এমনই পোজিশন—যার হাতার ভেতরেই কুদঘাট বাস টার্মিনাস। বাড়ি থেকে বেরিয়ে হেঁটে মধুবন সিনেমা—রানীকুঠির মোড় মিনিট সাতেক। সেখান থেকে কাকভোরে জগিং করতে করতে সোনালিকে সঙ্গে নিয়ে তুষার বিশ মিনিটের ভেতর গল্‌ফ ক্লাবের দেওয়ালের গায়ে মহুয়াদের ওখানে পোঁছে যয়ে। বিজয়গড়ের ভেতর দিয়ে ছুটে গিয়ে 'তানজোর' খাবারের দোকানটার কাছাকাছি এসে বাঁয়ে ঘুরলেই তিন-চারটে বাস স্টপের মাথায় গল্‌ফগ্রিনের শুরু। সেখান থেকে আরও বাঁয়ে এগোলেই গল্‌ফ ক্লাবের দেওয়ালের গা ধরে একটি নির্জন পিচ রাস্তা। এই রাস্তার গায়েই শিখা, মহুয়া, সঞ্জয় থাকে।

আজও তুষার ছুটতে ছুটতেই গিয়েছিল। সঙ্গে সোনালি। হাতঘড়িতে তখন পাঁচটা বেজে ছত্রিশ। কচু গাছ কাটার মত অন্ধকার কাটতে কাটতে সূর্যের প্রথম আলো হুড়মুড় করে এগিয়ে আসছে। বিজয়গড়ে সবে একটা চায়ের দোকান খুলেছে। সোনালি সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ল। তুষার একখানা লেড়ো কিনে দিতে ফের দৌড়। এক একদিন তো সোনালি গিয়ে এক লাফে সঞ্জয়দের বারান্দায় উঠে পড়ে। পড়েই জানালার শিকের ভেতর মুখ গলিয়ে দিয়ে মহুয়াকে ডাকে—ঘেউ। সাড়া না পেলে সে গিয়ে শিখার ঘরের দিককার দরজার কপাট নখ দিয়ে আঁচড়ায়—দরজা খোলো। খোলো। আমি এসেছি। দ্যাখো—

সোনালির হাড় গুঁড়নো সেই ঘেউ। বাড়ির সামনে। কেউ জাগল না। তুষার বুঝল, সবাই ঘুমচ্ছে। কেমন মায়া হল তুষারের। আয়! আয় সোনালি—বলেই তুষার ফিরবে বলে ফের জগ করতে শুরু করল। তার সঙ্গে সমান গ্যালপে সোনালি দৌড়তে লাগল।

তুষার লক্ষ্য করে দেখল, ফিরতি পথে সোনালি বার বার পেছন ফিরে দেখার চেষ্টা করছে। যদি কেউ দরজা খুলে এসে বারান্দায় দাঁড়ায়। যদি কেউ তাকে ডাকে। তুষার জানে, এই যদি কেউ মানে —শিখা, মহুয়া। ছোট যখন এসেছিল সোনালি—তখন তাকে শিখাই ফিডিং বটলে দুধ খাইয়েছে।

খানিক আগে যে চায়ের দোকান থেকে লেড়ো কিনে দিয়েছিল —সেখানে এসে সোনালি ফের থিতু হয়ে বসে গেল। আবার একখানা কিনে দিল তুষার। সেখানে বসে বসে খেল সোনালি। কিন্তু আর দৌড়তে রাজি হল না। তুষার যতই স্টার্ট নেয়—সোনালি ততই কোন ভ্রুক্ষেপ না করে নিজের তালে হাঁটতে লাগল। খানিক ছুটে গিয়ে তুষার ফিরে দেখে সোনালি অনেক পিছিয়ে পড়েছে। তাকে ধরে ফেলার কোন তাড়াই নেই সোনালির। আসছে যেন— কোন মার্চেণ্ট অফিসে খাতা লেখে। কোন তাড়া নেই। আবার তাড়াও আছে। রীতিমত নিজের একটা চালে হেঁটে দৌড়ে, দৌড়ে হেঁটে আসছে।

তুষার দাঁড়িয়ে পড়ল। চওড়া পিচের রাস্তাটা এখনও নির্জন। সামনেই অশোকা স্কুলের গায়ে বিদেশি ঝাউ। সোনালি এসে পেঁছতে তুষার আদর করে বলল, বেশ। আজ তোকে গান শোনাব—

বলেই তুষার নিজের সেই গানটা ধরল।

যদি সুন্দর-র-র

যদি সুন্দর-র-র একখান মুখ পাইতাম—

সোনালি তুষারের পাশে গম্ভীর চালে হাঁটতে হাঁটতে একবার ওপরের দিকে মাথা তুলে তুষারের মুখখানি দেখল। বেশ সুন্দর। মাথার চুল ছোট ছোটই। কান দুটি বেশ বড়। নাকটা ছুঁচলো।

মুখে কোন একস্ট্রা ফ্যাট নেই। তুষারকে খুব মনে ধরল সোনালির। তার দুই কান তুষারের গলার গাঢ় আওয়াজে ভরে যাচ্ছিল। মানুষ যে কেন কখনই, এমন সুন্দর গলা থাকতেও, ঘেউ ঘেউ করে না—তা আজও বুঝে উঠতে পারেনি সোনালি।

বাড়ি ফিরেই তুষার সোনালিকে চান করাতে বসেছে। গায়ের ডাঁস একটা একটা করে বেছে ফেলে সাবান মাখাচ্ছে। কলতলার দরজা খুলে। আর, গলায় সেই গান।

যদি সুন্দর-র-র

যদি সুন্দর-র-র একখান মুখ পাইতাম—

ঘুম থেকে উঠে তুষারকে না দেখে তপতী একাই চা করে খাবার টেবিলে বসে ছিল। তুষারকে ঢুকতে দেখে সে কিছুই বলেনি। তুষারও ঝোঁকে চলে। সে কোনদিকে না তাকিয়ে জুতো জামা খুলে পাজামা পরে খালি গায়ে সোনালিকে চান করাতে বসেই গুন গুন করে গানটা ধরল। এ গান সোনালির খুব পছন্দ। সাবানের ফেনায় গায়ের লোম মেঘ হয়ে ফুলে উঠতেই আনন্দে কাঁই কুঁই জুড়ে দিল সোনালি। তার ভেতর দিয়েই—

যদি সুন্দর-র-র—

তপতী আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। চেঁচিয়ে উঠল। আর 'যদি' কেন! পেয়ে গ্যাছই তো এই সাত সকালে—

ঘুম ভাল হয় তুষারের। ভোর ভোর রোজ জগিং। তারপর শরীরের নিয়ম মেনে—খুব খিদে না পেলে সে প্রায় কিছুই খায় না। খেলে বেছে বেছে খায়। মাছ, শশা, দই, একটা দুটো হাতেগড়া রুটি, কোন কোন দিন মাত্র এক কাপ ভাত মেপে। সঙ্গে ডাল। ফলে কখনই সে ক্লান্ত হয় না—যদি না সে অনেক দৌড়ে কিংবা অনেক নেচে নিজেকে ক্লান্ত করতে চায়। তাই এমনিতে সে সব সময়েই পায়রার পালকের মতই হালকা, ফুর্তিবাজ কিন্তু গম্ভীর—আর চোখ দুটি শান্ত।

সোনালিকে চান করাতে করাতে নিজের গানের ভেতর তপতীর

কথাগুলো শুনে তার মনে হল—এমন সুন্দর সকালে তপতী বুঝি কোন রসিকতা করল। সে সোনালির মুখে তাকাল। সোনালি আরামের চোটে লম্বা জিভ ঝুলিয়ে হ্যাঃ হ্যাঃ করে চলেছে। তুষার চেঁচিয়ে জানতে চাইল, কী বললে ?

এবার তপতী কলঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। যা বলেছি—ঠিক শুনতে পেয়েছ।

সত্যিই পাইনি। কী বললে বলোই না।

রোজ সকালে জগিংয়ের নামে তুমি আর সোনালি কোথায় যাও আমি জানি।

কোথায় যাই ?

মহুয়ার কাছে যাও তোমরা। রোজ সাত সকালে গিয়ে সুন্দর একখানা মুখ পাও। পাও না, বলো! আর যদি কেন!

তা যাই তো। রোজ নয়। মাঝে মাঝে যাই।

প্রায়ই যাও। রোজ যাও—

কী করে বুঝলে ?

ওদিকে গেলেই তোমার কেডসে—সোনালির থাবায় অন্যরকমের ঘাস—শুকনো ঘাসের ডগা লেগে থাকে রোজ।

সোনালির চান হয়ে এসেছে। গা মুছিয়ে দিতে দিতে হেসে ফেলল তুষার। হো হো করে। তারপর বলল, তুমি সব-মাঠের ঘাস চেন ?

চিনি। বলতে লজ্জা করছে না তোমার ?

লজ্জা করবে কেন ? আমি তো খারাপ কাজ করিনি তপতী।

—শিখা আমার মেয়ে। তার দরকারে, বিপদে আপদে, গাইডান্স দিতে যাব না ? আমি তার বাবা।

একশ'বার যাবে। তাতে তো আমি কিছু বলছি না। রোজ রোজ তোমাকে শিখার এত দরকার পড়ে!

শিখা একা নয়। তার মা থাকে সেখানে।

জানি। তার মা কেন বলছ! তোমার বউ বলো!

মহুয়া আর আমার বউ নয় তপতী। সেকথা তুমি ভাল করেই জান। মহুয়া সঞ্জয়কে বিয়ে করেছে। কিন্তু মহুয়ারও দরকার পড়ে আমাকে। ওদের হাতে সবসময় টাকা থাকে না।

ও-বিয়ে তো বিয়েই নয়। আইনের চোখে মহুয়া এখনও তোমার বউ। মহুয়া তোমাকে ডিভোর্স দেয়নি। আইনের চোখে তুমি এখন ওসমান। মহুয়া ওসমানের পয়লা বিবি। আমি আয়েসা সেই ওসমানের দুসরি বিবি।

সবকিছুই কি আইনের চোখে ঠিক হয় তপতী? ঠিক হয় না।

আমিও তো তা-ই জানতাম।

সকালবেলার চড়া রোদ এবার ঘরে এসে পড়ল। সেই রোদে দাঁড়িয়ে সোনালি কাঁপতে কাঁপতে গা ঝাড়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির মত সারা লিভিংরুমে জলের ফোঁটা ছড়িয়ে পড়ল। সে ফোঁটা গায়ে লাগতেই চিড়বিড়িয়ে উঠল তপতী। কাল কোথায় গিয়েছিলে?

কখন?

হলিডে-ইন থেকে বেরিয়ে গেলে বিকেল বিকেল। আমি তখন রিসেপশনে বসে। তুমি দিব্যি শিস দিতে দিতে নাচতে নাচতে বেরিয়ে গেলে- দেখলাম।

তুমি তো জান তপতী—আমি কোন সময় দুঃখিত দুঃখিত থাকতে পারি না।

থাকবেই বা কেন? তোমার কত আনন্দ! ঘরে একজন বিবি! বাইরে আরেক জন!

এ কথার কোন জবাব দিল না তুষার। সে নিজের মত করে বলতে থাকল, আমি হাঁটবার সময়েও পায়ের ভেতর নাচ পাই। গলার ভেতর কথা গুন গুন করে। একা থাকলে, ফাঁকা পেলে, আমি হুইসিল দিই তপতী। অদৃশ্য সুরের সঙ্গে নেচে উঠি।

যত ইচ্ছে নাচো। কাল কোথায় গিয়েছিলে তখন? আমি তোমার স্ত্রী।

তপতীর মুখ দেখে তার জন্যে খুব কষ্ট হল তুষারের। ঘুম থেকে উঠেও মুখখানি কুঁচকে গেছে। এই মুখের কথা মনে মনে

ভেবে আমি গান গাই—যদি সুন্দর একখান মুখ পাইতাম। আর সেই মুখ এখন!

কোথায় এমন গেলাম। মনে তো পড়ছে না—

এটা কী? এটা—

কী দেখি।

তপতী এগিয়ে দিল। একটা টিকিট।

ভাল করে দেখে হো হো করে হেসে উঠল তুষার। এ তো প্ল্যাটফর্ম টিকিট। শিখাকে ট্রেনে তুলে দিতে গিয়েছি। সব মেয়ের বাবা মা হাওড়া স্টেশনে গিয়েছিল। ওরা সবাই স্কুল থেকে দল বেঁধে ঝাড়গ্রাম গেল। এও তোমাকে বলতে হবে!

শিখার বাবা মা গিয়েছিল?

তুষার সোনালির গা মোছাতে মোছাতে তপতীর মুখে তাকাল। তারপর চোখ নামিয়ে চাপা গলায় বলল, না। মহুয়া যায়নি। তুমি আর আমি চাই বা না চাই—আমি আর মহুয়া এখনও শিখার বাবা মা।

তুমি ভোরে জগিং করতে হলে অয়ারলেস পার্কেই করবে।

অত ছোট মাঠে ভাল করে জগিং করা যায় না।

তাহলে ছুটতে ছুটতে পুঁটিয়ারির দিকে যাবে। কিংবা গড়িয়া অব্দি ছুটে যাও না! তুমি কিছুতেই আর মহুয়াদের বাড়ি যাবে না। সাত সকালে মহুয়ার কাছে যাবে না। কোন সময়েই যেতে পারবে না।

সোনালিকে ছেড়ে দিয়ে চোখ তুলে তাকাল তুষার। এখন এমন সুন্দর সকাল। চান করে উঠে গা মুছে দাঁড়ানো সোনালিকে ঠিক রাজপুত্রের মত দেখাচ্ছে। তার ভেতর দেরিতে ঘুম থেকে উঠে তপতীর মুখে নানারকমের ভাঁজ। সেই সব ভাঁজে জমা হয়ে গেল তপতীর এই এখনকার রাগারাগির তাপ। তপতী যদি ফাঁকায় একটু নেচে নিতে পারত—সেই সঙ্গে গুনগুনিয়ে ওঠা নিজের কোন গানের

মিশেল দিয়ে নিত—তা হলে ওসব ভাঁজ মিলিয়ে গিয়ে সারা মুখে একটা আনন্দ জেগে উঠত। চাই কি আমার মত হুইসিল দিয়ে উঠত। তার বদলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তপতীর গলার শিরা ফুলে উঠেছে। মুখে কোন নিশ্চিন্ত ভাব নেই।

আমি মা হতে চলেছি তুষার—

তাই বল!—বলে একছুটে কাছে চলে এল তুষার। এসেই তপতীকে জড়িয়ে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে সোনালি সেই হাড় গুঁড়োনো গলায় চেঁচিয়ে উঠল, ঘেউ—

সোনালির গাঢ় গলা এই ভাড়ার ফ্ল্যাটের দেওয়ালে দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে একদম বাজ পড়ার আওয়াজ তুলল। তাতে ঘাবড়ে গিয়ে তপতী দু'হাতে তুষারকে জড়িয়ে ধরল। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এল।

তুষার গলা নরম করে বলল, তুমি আগে বোসো।—বলে তপতীকে পাঁজা কোলে তুলতে গেল।

দরকার হবে না। এখনও সে সময় আসেনি।—বলে হেঁটে হেঁটে ডাইনিং টেবিলের লাগোয়া একটা চেয়ারে গিয়ে বসল তপতী। বসে বলল, আমার পেটে যে এসেছে—তারও তো তুমি বাবা!

তুষার কোন কথা বলল না। হঠাৎ ডাইনিং টেবিলের শেষে লিভিংরুমের যে বাকিটা ফাঁকা তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল। সে টের পাচ্ছিল, সেই অদৃশ্য সুরটা ভেসে আসতে শুরু করেছে। সেই সুর, যা শুধু সে একাই শুনতে পায়।

চেয়ারে বসে ফের তপতী বলল, তারও তো তুমি বাবা—

তুষার সরকার দু'খানি হাত পাখির ডানা করে দু'পাশে মেলে ধরে একটা পাক খেল। তারপর কোমরের কাছে শরীরের ওপরের ভাগটা যতটা ভাঁজ করা যায় ততটা করে, গম্ভীর গলায় বলল, নিশ্চয়, নিশ্চয়—

তুষারের সেই নাচের ভেতরেই তপতী জানতে চাইল, ও যখন স্কুল থেকে কোথাও যাবে—তুমি স্টেশনে তুলে দিতে যাবে?

নিশ্চয়। আগে জন্মাক—

তপতী আরও কী জানতে চাইল। তখন সুরটা পুরোপুরি এসে গেছে। সেই সুরের সঙ্গী হয়ে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে তুষার। তপতীর গলা আবছা মত কানে গেল তুষারের। সে আন্দাজে বলে উঠল, নিশ্চয়, নিশ্চয়। আগে জন্মাক, আগে বড় হোক—

তখন সোনালিও তুষারকে ঘিরে পাক খেতে শুরু করে দিয়েছে। তুষার তার নাচের ভেতর থেকে, তার নিজের সুরের ভেতর থেকে যতবারই একটা ফেরতাই-ধরতাইয়ের মত বলে ওঠে,—নিশ্চয়, ঠিক ততবারই সোনালিও বলে ওঠে—ঘেউ।

আঠার

তুই তো পাস করতেই পারবি না পল্টু।

আমি পাস করি, ফেল করি তো তাতে তোমার কিছু নয়। তুমি কি কোনদিন আমায় তুমি বলবে না? কোনদিন অশোক বলে ডাকবে না?

সমর স্যারের বারান্দায় এসে পল্টুর সঙ্গে শিখার দেখা। সমর-স্যার বাড়ির ভেতরে গেছেন খানিক আগে। বোধহয় টিফিন করে এসে একবারে পড়াতে বসবেন। এখনও অন্য স্টুডেণ্টরা কেউ আসেনি। সবে সকাল ন'টা।

পল্টুর খাতার পাতা উলটে পালটে দেখে শিউরে ওঠে শিখা। চুপ কর। এ তুই কী করেছিস?

কেন?

নিজের খাতা নিজে দ্যাখ। সমর স্যার তোর যা সব কেটেছিলেন —কেটে পাশে লিখে দিয়েছিলেন লাল কালিতে, তুই সবুজ কালিতে সেসব কেটে দিয়ে ফের ভুল বানানগুলো লিখেছিস?

আমার কিছু হবে না। আমারটা তোমায় ভাবতেও হবে না শিখা।

স্যার আসুন, আমি তোর কেরদানি সব দেখাব স্যারকে।

সাবধান। বলে একটু দূরে সরে গেল পল্টু। তারপর ট্রাউজারের বাঁ পকেট থেকে বাঁ হাতে একখানা ছোরা বের করে তিন ভাঁজে খুলে ফেলল ডান হাত দিয়ে। এবার সেখানা উঁচু করে বলল, যে আমার পথের কাঁটা হবে তাকে আমি দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেব।

ওরেব্বাস! কী বলছিস তুই?—ছোরা দেখে ঘাবড়ে গিয়েও কথাগুলো গুছিয়ে বলার চেষ্টা করল শিখা।

পল্টু দূরে সরে গিয়ে মাদুরের বাইরে দাঁড়িয়ে। সেখান থেকে বলল, স্যার যতবার আমার বানান কাটবে—আমিও ততবার স্যারের বানান কাটব—কেটে আমার বানানই লিখব।

কেন? তুই শিখবি কী করে? পাস করবি কী করে?

মাই উইশ। ফেল করি আর পাস করি, আমার বানানই লিখব।

তুই পাগল হয়ে গেছিস পল্টু।

না হইনি। আমি যা করব তা-ই ভুল? কোথাও আমার কোন কথা থাকবে না?—বলতে বলতে ছুরির ডগাটা এগিয়ে এনে শিখার বাঁ কনুইয়ের ওপরদিকে চেপে ধরল পল্টু। আমি তোমাকেও আজ ছাড়ব না—

কী করবি শুনি?

তোমাকে মেরে আমি নিজে সুইসাইড করব।

ভয় করছে শিখার। আবার এও মনে হল তার—দেখিই না কতদূর গড়ায়। সে চমকে উঠে বলল, আমাকে মারবি কেন?

এবার পল্টু সত্যি সত্যিই ছুরিটা একটু বেশি করেই শিখার কনুইয়ের ওপর চেপে ধরল। উঁহু। আর কোন কথা নয়। চলো—বিকজ আই লাভ ইউ।

কোথায়? স্যার আসবেন এখুনি।

গুলি মারো স্যারকে। আমি যা বলছি তাই শোনো। নয়ত ইউ আর ইন ডেঞ্জার—।

এ কী? সত্যিই ছুরি বসিয়ে দেবে নাকি?—মনের ভেতরে এ কথা ঘোরাফেরা করলেও শিখা বলল, ডেনজার বানান বল। আমি

কিন্তু এখুনি চেঁচিয়ে উঠব।

কথা শেষ না হতেই পল্টু হাতের ছুরিতে আর একটু চাপ দিল। সমর স্যারের বাড়িটা গাছপালার ভেতর থেকে বাইরে বিশেষ চোখে পড়ে না। কলকাতার ভেতর এ-বাড়ির উঠোনে সারাদিন চড়ুইরা ধুলো খেলে। সামনে আদি গঙ্গা। উত্তরে বাগান। গাছপালা। দক্ষিণে দুই তিন সারি বাড়ির আড়ালে পড়ে গেছে বাসরুট। সেদিক থেকে দু'শ আট নম্বর প্রাইভেট বাসের ইলেকট্রিক হর্ন।

লম্বা-লম্বা পল্টুর বড় বড় হাত পা। মাথাটাও চওড়া-কাঁধের ঠিক সেণ্টারে। দূর থেকে দেখলে, লোক লোক মনে হয় তাকে। কাছে এলে মুখ দেখে ভুল ভাঙে। তাড়াতাড়ি দাড়ি কামিয়ে বড় হওয়ার চেষ্টা করে পল্টু দাড়িটা কিছুটা গজাতে পেরেছে। নয়ত মুখের বাকি সব, চোখের চাউনি একটা কিংকিং সাইজের বালকের মতই। মেয়েরা এই বয়সে ছেলেদের চেয়ে বেশিই বোঝে। আর সেইজন্যেই ভয় পেল শিখা। আবার একথাও সত্যি, পল্টুর মত বড়সড়, তার চেয়ে বয়সে দু'তিন বছরের সিনিয়র একটা ছেলে তার জন্যে এত ভেবেচিন্তে ছুরি বের করেছে, জেনেশুনে নিজের ভুল বানানই চালু রাখছে—সেটাই বা কী ?—দেখিই না—

পল্টু শিখাকে প্রায় ঠেলে উঠোন দিয়ে হাঁটিয়ে পাথরকুচি পাতার ভাঙা বেড়ার কাছে নিয়ে গেল। নাউ জাম্প—

ও কী ? আমি কি তোর মত ফুটবল খেলি ?—বলেও দিব্যি একটি লাফ দিল শিখা।

এরপরই আধখানা বানিয়ে ফেলেরাখা একটা বাড়ি। লতায় ঢাকা। লোক আসেনি কোনদিন। তারপরই তিনটে বাড়ি পরপর। সেইসব বাড়ির পেছন দিয়ে পল্টু শিখার পিঠের কাছে ছোরা ঠেকিয়ে তাকে হাঁটিয়ে যেখানে নিয়ে এল—সেখান থেকেই সমর স্যারের টিউটোরিয়ালের বনভোজনের সেই বাগানের শুরু। হরিণ নেই। কিন্তু দোয়েল আছে। অন্ধকার আছে। আছে আকাশ থেকে নেমে আসা চৌকো চৌকো রোদ্দুর। বহু পুরনো জামরুল গাছ। বুড়ো

আমগাছ। সবেদা, ফলসার গাছ। সবই সেই প্রিন্স গোলাম মহম্মদের লাগানো। অন্তত একশ বছর আগে।

ওরা হাঁটতে হাঁটতে প্রিন্সের সেই ভাঙাবাড়িটার সামনে এসে পড়ল। নাম-সন লেখা পাথর ঢাকা পড়ে আছে। শিখা বলল, নে —এবার ছুরিটা নামা। আমাকে জাম্প দিতে বলিস—তোর অ্যাতো সাহস? আমি কার মেয়ে জানিস না?

জানি। তোমার সালোয়ার ছিঁড়ে গেছে—

কোথায়?

পায়ের কাছে।

পাশ ফিরে দেখে নিয়ে শিখা বলল, যাগ্গিয়ে—ছিঁড়ুক গে। আমাকে আর লাফাতে বলবি? আমি বাবার সঙ্গে লং জাম্পও প্র্যাকটিশ করেছি।

এই প্রথম পল্টু হাসল। বাঁকা হাসি। তোমার সে বাবা আর নেই। এখন সোনালির সঙ্গে মাথা নিচু করে হাঁটে।

মানে? কী বলতে চাস?

তোমার ছোট মায়ের কাছে ভেড়া হয়ে আছে!

আমার কোন ছোট মা নেই। বাবার নতুন বউ।—বলে আর কোন কথা বলতে পারল না শিখা।

পল্টু 'দেখি' বলে বাঁ হাতে শিখার গলাটা জড়িয়ে ধরল। ডান হাতে ছোরা উঁচিয়ে।

একি? একি?—কী করছিস?

পল্টু বাঁ হাত লোহার আঙটার মতই শিখার গলায় বসে গেল। শিখা আর কথা বলতে পারল না। সে বাঁ হাত দিয়ে পল্টুর গেঞ্জির ওপর দিয়ে খামচে ধরার চেষ্টা করতে লাগল। ফ্যানলনের গেঞ্জি। যতবার খামচে ধরে শিখা—ততবারই নখ পিছলে যায়।

পল্টু অনেকটাই লম্বা। সে যতবারই তার মাথা নামিয়ে আনে ততবারই শিখা ছটফট করে বেরিয়ে যাবার চেষ্টায় মাথা সরিয়ে ফেলে। ফলে পল্টুর ঠোঁট জায়গা মত পড়ে না।

শিখাও তার বাবার সঙ্গে দৌড়ঝাঁপ করা মেয়ে। তাকে কিছুতেই বাগে আনতে না পেরে পল্টু হাতের ছোরাখানা মাটিতে ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, তবে রে—!

দু'হাতের সাঁড়াশিতে ধরা পড়ে শিখা তার দুই ঠোঁট একদম শক্ত করে বুজিয়ে ফেলল। তার ওপরেই মুখ ঘষতে অন্ধ বাঘের মতই ফের চেঁচিয়ে উঠল পল্টু—কোথায়? অ্যাঁ? পাচ্ছি না কেন? মুখ খোলো শিখা—

তারপরেই প্রচণ্ড চিৎকারে পল্টু মাটিতে গিয়ে ছিটকে পড়ল—বাবা গো।

শুকনো পচা পাতার ওপর উঠে দাঁড়াতে গেল পল্টু। পারল না। তার নতুন গজানো গোঁফের নিচে লালচে রক্ত বেরিয়ে এসেছে। সে মাথা তুলে তাকাল। শিখা তার কাঁধে নেমে যাওয়া কামিজ টেনে ওপরে তুলছে। মাথার চুল খুলে গিয়ে উসকো খুসকো। ঠোঁটের ওপরটা ভেজা। কপালের বিন্দিয়াটা সরে গিয়ে ভুল জায়গায়। শিখা দেখতেও পায়নি—তার ক'হাত দূরেই একটা পদ্মদোয়েল। সবেদা গাছটার মোটা শিকড়ে বসে টালুস টুলুস করে শিখাকে নানাভাবে দেখছে।

শিখা চেঁচিয়ে গলার কণ্ঠমণি, শিরা সব ফুলিয়ে ফেলল। আমি তোকে ভালবাসি না। ভালবাসি না। তুই কেন আমাকে চুমু খাবি? বল শালা? বল?

—চেঁচাতে চেঁচাতে কেঁদেই ফেলল শিখা। তার ভেতরেই বলতে লাগল, ভালবাসি না—ভালবাসি না—তবু জোর করে চুমু খাবি?

এবার মাটিতে পড়ে-থাকা একটা মাটির ঢেলাই কুড়িয়ে নিয়ে বেদম জোরে পল্টুকে ছুঁড়ে মারল। পল্টু সময়মত মাথা সরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর ছোরাটা খুঁজতে খুঁজতে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, আমিও তোকে আর ভালবাসি না। ভালবাসি না। তোকে আমার আর চাই না। তাই জোর করে তোকে চুমু খেয়ে দেখলাম।

বলতে বলতে নুয়ে পড়ে ছোরাটা খুঁজছে পল্টু। ঘাস। মাটি

ফুঁড়ে উঠে-আসা মোটা শেকড়—যার গাছ বেশ দূরে। পচা পাতা। কচু বন। কোথায় পড়ল ছোরাটা ?

পল্টুর কথায় চমকে একদম থেমে গেল শিখা। কী ?

জোর করে তোকে চুমু খেয়ে দেখলাম—ঘুরে দাঁড়িয়ে বলতে বলতে পল্টু হাত দিয়ে ঠোঁটের ওপর শিখার দাঁত বসানো জায়গা থেকে গড়িয়ে আসা রক্ত গোঁফ সমেত মুছে নিল। আমাকে তুচ্ছ করে তোর মুখে গর্ব ফুটে ওঠে। মুখের সে-জায়গাটা কেমন, সেখানে আলাদা কোন গন্ধ আছে কিনা—তাই দেখলাম। জোর করে, চুমু খেয়ে।

বলেই ফের নুয়ে নুয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটতে লাগল পল্টু। যদি ছোরাখানা খুঁজে পাওয়া যায়। শিখার দিকে সে আর ফিরেও তাকাল না।

জায়গাটা কেমন! জায়গাটা কেমন ? গন্ধটা কেমন ?—বিড় বিড় করে বলতে বলতে শিখা আবার একটা ঢেলা কুড়িয়ে নিয়ে যত জোর আছে তার গায়ে সব দিয়ে সে পল্টুকে ত্যাগ করল। চোখে জল। বিন্দিয়া ভ্রু-র ওপর। মাথাটা আঁচড়ানো দরকার। এবার দেখা গেল পায়ের কাছে সালোয়ারের ছেঁড়া জায়গাটা আরও ছিঁড়ে গেছে। হাতে ঢিল।

পাশ থেকে এ সব দেখতে পেয়েই আস্ত একটা দেওয়ালের মত পলকে ঘুরে দাঁড়াল পল্টু। হাত নামা। হাত নামা। বলছি হাত নামা—বলে বাজখাঁই গলায় ফেটে পড়ল।

চমকে শিখার হাত থেকে ঢেলাটা পড়ে গেল।

অমনি পল্টু শিখার একদম কাছে এগিয়ে এসে বলল, যাঃ! পালা! ভাগ এখান থেকে। অমন ছোরাটা হারিয়ে গেল—

আবার পল্টু ছোরাটা খুঁজছে। শিখার দিকে আর তাকাচ্ছেই না।

অপমানে শিখা সব কান্না গিলে ফেলল। গাছপালার ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দু'হাত দিয়ে চোখ ডলে ডলে মুছে ফেলল। সমর স্যারের ওখানেও আর গেল না।

ব্যস রাস্তায় পড়ে শিখা বাসে উঠল না। ওঠার উপায় নেই এত ভিড় অফিসটাইমে। অটোতেও উঠল না। সে হাঁটতে লাগল। হাঁটতেই থাকল। সারা আকাশের আলো একটা অদৃশ্য থাবা হয়ে যেন তারই মুখের ওপর নেমে আসছে। তাকে মারবে বলে। অপমান করবে বলে।

ইচ্ছে করলে রিকশা করে সে ট্রামডিপো অবধি এগিয়ে যেতে পারে। কিন্তু রিকশায় উঠল না। হাঁটতেও তার ভাল লাগছে না। সবাই ব্যস্ত। তার কথা ভাবার কেউ নেই। এখন এই রাস্তার পাশে কোন গাছপালা থাকলে, তার ছায়ায় শুয়ে পড়তে পারলে শিখার ভাল লাগত।

বাঁ হাতে টেকনিশিয়ান স্টুডিও। ডাইনে নন্দী রিসার্চ আকাদেমি ফেলে শিখা যখন ট্রাম ডিপোয় হাজির হল তখন জুবিলি পার্কের রাস্তা দিয়ে তার আর হেঁটে বাড়ি ফেরার ইচ্ছে হল না। কোন অটো ওদিকে যায় না। গেলে পনের টাকা চাইবে। রিকশায় উঠবে বলে খুঁজল। কোন রিকশাই যেতে চাইল না। তারা রানীকুঠি, বাঁশ-দ্রোণির প্যাসেঞ্জার চায়।

রিকশা স্ট্যান্ডের উলটোদিকেই মেট্রো স্টেশন। কী মনে হতে ফুটপাথে বসা দোকানির কাছ থেকে শিখা এক টাকায় একখানা হাতচিরুনি কিনে ফেলল। মাথাটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আঁচড়ে নিয়ে কপাল থেকে আন্দাজে বিন্দিয়াটা খুঁটে নিয়ে জায়গামত বসাল। তারপর ছুটে গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে মেট্রোর টিকিট কাটল তিন টাকা দিয়ে।

পাতালে নামতেই ট্রেন। এসপ্ল্যানেডে ওপরে উঠে এসে শিখা দেখল, বিখ্যাত সেই ঘড়িতে সওয়া এগারটা। সে সামনের রাস্তা ক্রস করে হলিডে-ইনে ঢুকল।

ঢুকেই লজ্জা পেল। কেমন ঘিয়ে রঙের আলো। তকতকে মোজাইক মেঝে। আর ঠাণ্ডা। খুব সাবধানে রিসেপশনের দিকে তাকাল। না। সেখানে তার বাবার বউয়ের মত কাউকে দেখতে পেল না। শুনেছে রিসেপশনেই বসে তপতী নামে সেই মহিলা। গুটি

গুটি পায়ে কাউন্টারে গিয়ে বলল, তুষার সরকার এসেছেন কিনা একবার দেখবেন ?

বলেও ঢিপ ঢিপ করে শিখার বুক কাঁপছে। সে বা তার মা কোনদিনই হলিডে-ইনে আসেনি। এখানে সে এই প্রথম এল। আর এল এমনই বাজেভাবে। পায়ের কাছে সালোয়ারের অনেকটাই ছিঁড়ে গেছে। বাবাকে সে কী বলবে ? কিছুই ভেবে পাচ্ছে না। কিন্তু বাবা, তোমাকে বড্ড দরকার। খুব দরকার।

ফোন তুলে কী যেন বলেটলে রিসেপশনের সাজাগোজা মেয়েটি আলতো গলায় বলল, মিস্টার সরকার এখনও আসেননি। আপনি ওয়েট করবেন ?

না—বলে শিখা বেরিয়ে এল।

উলটো দিকের বাস ফাঁকা। একটি ফর্টি সেভেন-বি ধরে ফের ট্রাম ডিপোয় এসে যখন শিখা নামল তখন সূর্য ঠিক মাথার ওপর। আর হাঁটতে ইচ্ছে করল না তার। সালোয়ারের চোরা পকেট থেকে পার্সটা খুলে দেখল। একটা পাঁচ টাকার নোট পড়ে আছে।

রিকশায় বাড়ি ফিরে দেখল, দরজায় তালা। তার মানে মা তার কাজ নিয়ে দিতে গেছে সোনাপট্টিতে। আর সঞ্জয় ? সে তো সেই বেলা দুটোয় বেরয়। নিশ্চয় দরজায় তালা দিয়ে বড় রাস্তায় কিছু কিনতে গেছে।

রিকশা ছেড়ে দিয়ে শিখা বারান্দায় ওঠার সিঁড়ির ধাপে গিয়ে বসল। সামনে ভাঙা পাঁচিলের সবুজ ঘাসের গল্‌ফ মাঠ। এখন আকাশে মেঘ থাকে না। সূর্যের আলো ইচ্ছে মত ছুটে গেছে সব দিকে। বাড়ির সামনের পিচের রাস্তায় কোন লোক নেই। গরু নেই। রিকশা নেই।

কান্নায় ভেঙে পড়ল শিখা।

সে দুই হাঁটুর ওপর বগল রেখে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। জোরে। ইচ্ছে মত। একদম স্বাধীনভাবে। আশপাশের ঘুমন্ত সব বাড়ি, গল্‌ফ খেলার মাঠ, মাঠের পুরনো পুরনো সব গাছ সেই

কান্নায় মিশে গিয়ে একাকার হয়ে গেল।

এমন অদ্ভুতভাবে বসে থাকতে থাকতে কখন শিখা হাঁটুর ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। কান্না চলে গেছে তার ঘুমের দেশে। ঘর খোলা থাকলে সে বিছানায় গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত। ঘুম সব অপমান, সব আনন্দকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়।

হঠাৎ একটা গাড়ি থামার আওয়াজে মাথা তুলে তাকাল শিখা। বাবা—

ট্যাক্সি থেকে নামতে নামতে তুষার বলল, হোটেলে গিয়েই শুনলাম—একটি মেয়ে আমার খোঁজ করতে এসেছিল। ঠিক ধরেছি। তুই—

ট্যাক্সি চলে গেল। তুষার লম্বা লম্বা পায়ে ছুটে এসে শিখার পাশে সিঁড়ির ধাপে বসল। একজনকে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে ছুটে এলাম। কী হয়েছে মা ? আর সবাই কোথায় ? দু'জনেই বেরিয়েছে। তা এক্সট্রা চাবি রাখিস না কেন ?

মোট দুটো চাবি। দু'জনের কাছে থাকে।

আরেকটা চাবি করে তোর কাছে রাখবি মা। চল—সামনের গল্‌ফ মাঠে গিয়ে বসি।

না। বলে—শিখা কান্না চাপতে আবার হাঁটুর ওপর মাথা রাখল।

রাস্তা শুনশান। ফাঁকা বাড়ির বারান্দায় একা বসে শিখা। খানিক আগে তার খোঁজে হলিডে-ইনে এসে ঘুরে গেছে। খুব কিছু না হলে তো শিখা অতদূর যাবার মেয়ে নয়। তুষার শিখার মাথায় হাত রাখল। কী হয়েছে মা ?

মাথা হাঁটুতে চেপে রেখেই কান্না আটকে শিখা বলল, কিচ্ছু না।

কিছু হয়েছে। আমাকে বল। আমি তোর বাবা।

কোন জবাব দিল না শিখা খানিকক্ষণ। তারপর বলল, তুমি ফিরে এসো বাবা—

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলতে পারল না তুষার। তারপর বলল, আমি

তো চেয়েছিলাম সবাই একসঙ্গে থাকি। আমি তো সবাইকে ভালবাসি।

তা হয় না বাবা। মায়ের পক্ষে সেটা খুব অপমানের।

তপতীও অ্যাডামেণ্ট। আর এখন তো সে সব কথা আর আসেই না। তোমার মা সঞ্জয়কে বিয়ে করেছে।

করেছে? না, তুমি বিয়ে দিয়েছ?

যা স্বাভাবিক ছিল—তা-ই করেছি শুধু। তারপরেও তো আমি তোমাদের সবাইকে খুব ভালবাসি। আগের মতই ভালবাসি। তোমার মায়ের একজন সঙ্গীর দরকার ছিল। সঞ্জয় ইজ ডিভোটেড টু হার।

সঞ্জয় সঞ্জয় কোরো না আমার কানের কাছে।

সঞ্জয় তো খারাপ ছেলে নয়।

খারাপ বলেছি? কিন্তু তুমি আমার বাবা। আমি ওদের নাম শুনব কেন? শুনতে চাই না।

সে তোমার মায়ের স্বামী।

শিখা কোন কথা বলল না।

তুষার আস্তে আস্তে একা একা বলল, কয়েকদিন অন্তর ভোর ভোর আমি ছুটে আসি—তুমি কেমন আছ, মহুয়া কেমন আছে, সঞ্জয় বা কারও অসুখ-বিসুখ করল কিনা—তাই জানতে। কোন কিছুর দরকার আছে কিনা, কোন অসুবিধে হচ্ছে কিনা....

আঃ! শুধু এ জন্যে তুমি আর এসো না বাবা—

শিখা, আমি তোমাকে, মহুয়াকে, তপতীকে—সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কেউ তোমরা রাজি হলে না। অথচ আমরা সবাই একসঙ্গে থাকতে পারতাম। কোন অসুবিধে ছিল না। একজন মানুষ—আমার মত একজন মানুষ—দ্যাখো এখনও আমি কতটা ফিট—কতটা উৎসাহী সব ব্যাপারে—গান ভালবাসি, রোজ সকালে ঝাড়া এক ঘণ্টা দৌড়ই, নাচতে ভালবাসি। আমি একই সঙ্গে অনেককে ভালবাসতে পারি। ভালবাসতে চাই—

বাবাকে একনাগাড়ে এভাবে কথা বলতে দেখে শিখা অবাক হয়ে

তাকাল। তারপর বলল, কেন বুঝতে চাইছ না—তা হয় না বাবা। তা হয় না। আমি একটা কথা বলি—

কী?

তুমি আর এসো না বাবা। আমাদের যত কষ্ট হোক—আমাদের কষ্ট নিয়ে আমাদেরই থাকতে দাও। তুমি আর এসো না। আমার কষ্ট হয়। আমাদের অসুখ-বিসুখ, সুবিধে-অসুবিধে নিয়ে আমাদের থাকতে দাও।

শিখা!!

হ্যাঁ বাবা।

উনিশ

গলফ্ ক্লাবের ভাঙা পাঁচিলের গা ধরে তুষার ফাঁকা রাস্তা দিয়ে বেলা দেড়টা নাগাদ মেট্রো স্টেশনের সামনে এসে দাঁড়াল। সে যখন আসে তখনও শিখা একা বারান্দায় ওঠার সিঁড়ির ধাপে বসে।।

পাতাল রেল ধরে একদম এসপ্ল্যানেডে এসে ওপরে উঠলে—সামনেই হলিডে-ইন। কী মনে হল তুষারের। সে ট্রামে উঠল। দুপুরবেলা একটা বাতাস দিল। রাস্তার মোড়ে মোড়ে বারুইপুরের পেয়ারা। সিঙ্গাপুরি কলা। চওড়া রাস্তা। এসব দিকেই স্বাস্থ্য, আনন্দ থাকে। আমি সেসব থেকে দূরে সরে যাচ্ছি।

প্রায় তিন বছর আগে শিখার সঙ্গে সেই শেষ দেখার দুপুরটা তুষার এভাবে খুঁটিনাটি সমেত বার বার মনে করে দেখেছে—একটা দৃশ্যের পর আরেকটা দৃশ্য পর পর সাজিয়ে নিয়ে ভাববার চেষ্টা করেছে,—তা হলে কেন সেদিন শিখা আচমকা আমার খোঁজে হলিডে-ইনে এসেছিল? যদি এলই তবে আমি যখন ট্যাক্সি করে ওর কাছে ছুটে গেলাম—ও কেন বলল, তুমি আর এসো না বাবা—আমাদের কষ্ট নিয়ে আমাদেরই থাকতে দাও?

কলকাতার ভেতর এত কাছাকাছি থেকেও আমি আর কোনদিন শিখা, মহুয়া, সঞ্জয়কে দেখতে যাইনি। এখনও জানি না, শিখা

কেমন আছে, মহুয়া কেমন আছে, সঞ্জয় কেমন আছে।

হলিডে-ইনের কিচেন থেকে বাঁয়ে বেসমেণ্টে স্টিলের পাত ফেলে দেওয়া করিডর। সেখানে পায়রার হালকা পায়ে তুষার মোটা মোটা পাইপের জয়েণ্ট, টি এলবো সব চেক করে দেখছে। সারা হোটেলটার ফুসফুসের কলকবজা তারই হাতে। দু'ধারে পাইপের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এই সরু করিডর চলে গেছে। এই করিডরই আমার জগৎ। এখন আমার একদিকে হলিডে-ইনের একদিককার দেওয়াল উঠে গেছে। এই দেওয়ালে কোন জানলা নেই। এই ব্যাপারটাই তুষারের বড় অপমান লাগে। আরেক দিকে সরু মোটা নানা সাইজের পাইপে যেন জঙ্গল। এই জঙ্গলের পেছনেই সেই কলকাতা। সেখানে এখন দরদর করা ঘামের দুপুর।

তুষার মিটারঘরের দরজা খুলল। ঘরের দেওয়াল জুড়ে সারি সারি সব মিটার। বড় ছোট অগুনতি ফিউজ। মিটারঘরের পাল্লা ভেজিয়ে দিয়ে তুষার আবার করিডরে এসে দাঁড়াল। সরু কোমরে দু'হাত রেখে তার এখন মনে হচ্ছে—শরীরটা তো এখনও চাবুক। তিন থাক ডিগবাজি দিয়েও স্প্রিংয়ের মত সটান দাঁড়িয়ে পড়তে পারি। কিন্তু এসব কে দেখবে?

নিজের ছোট্ট টেবিল থেকে ইণ্টারকমে বাটন টিপল তুষার।

ওপর থেকে মাজা মেয়েলি গলা ভেসে এল, ইয়েস। রিসেপশন।

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলতে পারল না তুষার।

আবারও ভেসে এল, দিস ইজ রিসেপশন—

তপতী আছে?

ওঃ! তুষার। কতবার বলব, তপতী তো আর আসবে না। সে রিজাইন দিয়েছে। বলেছিল, হয়ত কোন এয়ারলাইন্সে জয়েন করতে পারে।

তপতীরই পুরনো বান্ধবী সুজয়া ফোন ধরছে। রিসিভারটা নামিয়ে রাখল তুষার। তারপর বিড় বিড় করে বলল, শিখা বারণ করেছিল তাদের কাছে যেতে। যাইনি আর। কুদঘাটের সিমেণ্ট

ব্রিজের মুখে তপতীকে নিয়ে থাকলাম। তপতী অনর্থ করেছিল। তুমি আর মহুয়াদের ওখানে যাবে না। কিছুতেই যাবে না। যাইনি। তপতী নিজেই চলে গেল। চোখ বুঁজে ফেলল তুষার। সঙ্গে সঙ্গে একটা অন্ধকার ছুঁচের মত তার দুই চোখে ঢুকে গিয়ে অন্য একটা জগৎ আলোয় আলো করে দিল। খোলা চোখে সে জগৎ দেখা যায় না। সেখানে কচি কচি কয়েকটা আঙুল ভেসে উঠল। ছোট্ট সোমা দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তপতী কোত্থেকে এসে মেয়েকে সরিয়ে নিল। সে তার পাকা চাকরি থেকে যখন রিজাইন দিল—তখন তুষার সিধে তপতীর সামনে গিয়ে বলেছে—রিজাইন দিচ্ছ কেন? পার্মানেণ্ট পোজিশন—

আমি তোমার মুখ দেখতে চাই না আর। আমি কিছুতেই আর এখানে থাকব না।

আমার মেয়ে? সোমা?

সোমা আমার। কোর্টের কাছ থেকে সোমার কাস্টডিটি আমিই পেয়েছি। তোমার মত রেকলেস, ডিজঅনেস্ট বাবাকে কোর্টও চিনতে পেরেছে।

সোমা বড় হলে?

বড় হলে সে যা ভাল বুঝবে তাই করবে। এখন সরো। আমি যাব।

আমি ডিজঅনেস্ট নই তপতী। আমি তোমাকে ভালবাসি। ভীষণ ভালবাসি।

আয়নার সামনে গিয়ে নিজেকে সেসব কথা বোলো। সরো।

তুষারকে কুটোর মত সরিয়ে দিয়ে তপতী খুট খুট করে এগিয়ে গেল। তুষারের মনে হল, একখানি চলন্ত পাথর যেন তপতী। দম দেওয়া রয়েছে—তাই মাপা পায়ে রিসেপশন থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে গেল।

এ বড় নিরুপায় দশা।

আমি শিখার কথা ভাবি। মহুয়ার কথা ভাবি। কোন অসুবিধে

হল কিনা খোঁজ নিতাম। দেখতাম। মানুষ হয়ে এসব না করে থাকি কী করে? আমি সবাইকে নিয়ে সুখে থাকতে চাই। এই সবাইকে নিয়ে ব্যাপারটাই শিখার কিছুতেই ধাতস্থ হল না।

হল না তপতীরও। আমি যে ওকে সত্যিই ভালবাসি তা ও মানলই না, বিশ্বাসই করল না। ভাবল, আমার ভালবাসা সবটাই জুড়ে আছে শিখাদের দেখতে যাওয়া, খোঁজখবর নেওয়ার ভেতরে। আমি যে তপতীকে দেখলেই আনন্দ পাই তা ও জানেই না।

সকালের শিফট শেষ হল বেলা তিনটেয়। হলিডে-ইন থেকে বেরিয়েই জমজমাট কলকাতা। একটা বড় নদী যেন। বয়েই চলেছে। জুলাইয়ের বৃষ্টিভেজা রোদ্দুর। তার ভেতর দিয়ে তুষার হাঁটতে লাগল। বাস এখন এদিকটায় দাঁড়ায় না। সেই পার্ক স্ট্রিটে গিয়ে পাওয়া যায়।

হায়ার সেকেণ্ডারি দিয়ে শিখা কি আর পড়ল? না, কোনও কাজ নিল? টিউশনি? পাস করতে পেরেছে কি আদৌ? যদি করে থাকে তো এখন কী পড়ছে? বড় আফসোস হল তুষারের। পাস করুক বা না করুক—এক বাড়িতে না থাকলেও সবাই যদি সবার জন্যে ভেবে মিলেমিশে থাকতে পারতাম তো—এতদিনে শিখাকে আমি হাণ্ড্রেড মিটারস্ রানে চ্যাম্পিয়ন করে তুলতে পারতাম। ও যতই বড় হচ্ছিল—ততই লম্বা স্টেপ ফেলছিল। রীতিমত অ্যাথলিটের স্টেপ। শিখা—

তুষারের চোখের সামনে সারা ময়দানের মাথায় বৃষ্টিভেজা আকাশটা একখানা ফুলস্কেপ কাগজের মতই গোল হয়ে গুটিয়ে গেল। এই সময়টায় বাস কিছু ফাঁকা থাকে। কত রুটের কত বাস যাচ্ছে। কোন্‌টায় উঠবে তা জানে না তুষার। সারা পৃথিবী এখন তার কাছে একদম ফাঁকা লাগল।

কী ভেবে তুষার সরকার সামনে দাঁড়ানো ফাঁকা একটা বাসে উঠে বসল। জানলার পাশের সিটে বসে বৃষ্টি দেখলে মনে হবেই ঃ ফোঁটাগুলো বুঝি আমারই মনের ওপর গিয়ে পড়ছে। তুষারের ভাবখানা এখন—বাস যেদিকে যায় যাক।

রাসবিহারীর মোড়ে চশমার দোকানটার সামনে বাস এসে দাঁড়াতেই তুষার নেমে পড়ল। এই মোড়টা একসময় কত নিজের ছিল তার কাছে ঃ এলেই মনে হত নিজের জায়গায় এলাম। পানের দোকান, ক্যাসেটের দোকান, জুতো পালিশ, পেয়ারা, হাত ব্যাগ সারানো—

সব হয় এখানে। আর তপতীর সঙ্গে ভাব হওয়ার পর যখন তুষার প্রথম জানল কাছেই ওদের বাড়ি, তখন কী যে ভাল লেগেছিল তুষারের!

এখন তুষার নিজের অজান্তেই মোড়টা পেরিয়ে ডাইনে সদানন্দ রোডে ঢুকল। বাড়িগুলো সেই একই রকম আছে। বই বাঁধাইয়ের দোকানটা এখনও খোলেনি। তপন থিয়েটারের নতুন নাটকের হোর্ডিংগুলো টাঙানো হচ্ছে। এই রাস্তায় বিষ্ণু দত্ত নামে 'সাতেও না পাঁচেও না' টাইপের একজন লোক থাকেন। এখনও আছেন কিনা জানি না। তিনি এক সময় আমার শ্বশুর ছিলেন। দ্বিতীয় শ্বশুর। প্রথম শ্বশুরকে আমি দেখিনি। মহুয়ার সঙ্গে আমার বিয়ের আগেই তিনি মারা যান।

সদানন্দ রোডে ঠিক বাড়ির সামনে এসেই দাঁড়াল। সামনের দরজা খোলা। তপতী কি এখন আছে ? অনেকদিন দেখি না। দেখি না সোমাকেও। বারান্দায় উঠে এল তুষার। এই বাড়িতে অমলা দত্ত নামে একজন—ভাবতে ভাবতেই তুষার দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে শুনিয়ে বলল—বিচ্ থাকে। বিচ্—

দরজায় কড়া নাড়ল। কেউ সাড়া দিল না। তুষার কিছুর পরোয়া না করেই ঘরের ভেতর এক পা এগিয়ে গেল। কেউ নেই নাকি বাড়িতে ? অনেক সময় বিকেলের দিকে তপতী কুদঘাটের বাড়িতে ঘুমিয়ে পড়ত। ছুটি-ছাটার দিনে। এখন তো তপতীর ছুটিই যাচ্ছে। আমি নেই তার জীবনে। চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। যদি কোথাও জয়েন না করে থাকে তো ছুটিই এখন তপতীর।

তুষার আরেকটু এগিয়ে গেল। এ বাড়িতে তপতীর স্বামী হয়ে এসেছি যে ক'বারই—কখনই কেউ আমাকে এখানে ওয়েলকাম করেনি। তবু এ বাড়ির অন্ধি সন্ধি আমার মুখস্থ। তিনখানা ঘর। দোতলায় বাড়িওয়ালা। পুরনো বাড়ি। ভেতরে একটা উঠোন। তার ওপরেই কলঘর, রান্নাঘর। তপতী যে ঘরখানায় থাকে—মানে বিয়ের পরে এসে উঠত—তার পেছনের জানলা দিয়ে ছোট একটা খোলা মাঠ দেখা যায়।

কারও সাড়া না পেয়ে সে আন্দাজেই খুব নরম গলায় ডাকল, সোমা—

ভেতর ঘর থেকে কী যেন নড়ে উঠল। বেড়াল নয়ত ? সোমা

এখন স্কুলে নিশ্চয়। ঠিক এই সময় সদর দরজা খোলা! বাড়িতে কেউ নেই। আশেপাশেই গেছে হয়ত।

ফের সে ডাকল, সো-ও-মা-আ—

কে?

নিজের মেয়ের গলা পেয়ে তুষার এক লাফে ভেতর ঘরে চলে গেল। পায়ে সাদা জুতো। গায়ে বাইরে বেরবার ফ্রিল দেওয়া বাহারি ফ্রক। মেঝেতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাটের ওপরে রাখা তিনটে পুতুল নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। পুতুলের মাথায় লাল ফিতে। সোমার মাথায় লাল ফিতে দিয়ে ঝুঁটি বাঁধা।

তুমি কে?

আমাকে তুমি চেন না?

না।

আমাকে তোমার মনে পড়ে না?

পুতুলখেলা থামিয়ে সোমা অবাক হয়ে তুষারের মুখে তাকাল। তারপর গম্ভীর হয়ে বলল, না।—তারপর পুতুলকে শোয়াতে শোয়াতে বলল, বোসো। দিদিমা এক্ষুনি আসবে। বোস। রাস্তার ওপারে চিঠি ফেলতে গেছে।

তুষার কোন কথা বলতে পারল না। তা বছর খানেক হল সোমা তাকে দেখেনি। কচি কচি আঙুল দিয়ে সোমা তার পুতুলের গায়ে ছোট কাঁথা টেনে দিল। সারা বাড়িতে কোন শব্দ নেই। যে যার মত বেরিয়ে গেছে। অমলা দত্ত এক্ষুনি এসে পড়তে পারে।

কোথায় যাচ্ছ? বোসো। দিদিমা এক্ষুনি ফিরে আসবে।

তুষার বেরিয়ে আসার সময় বলল, আমি একটু ঘুরে আসছি।

দিদিমা এলে কী বলব? কে এসেছিল?

এইটুকু মেয়ে। বেশ বুঝদার বলিয়ে কইয়ে হয়েছে। বেরিয়ে আসতে আসতে তুষার বলল—বোলো—কেউ না।

কিছু বুঝতে না পেরে সোমা বড় বড় চোখে তাকাল।
